নেকড়ে মায়ের মানব শিশু

পৃথীরাজ সেন

পূর্বাচল
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীসুধীন্দ্র চৌধুরী
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

মুদ্রাকর : শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

রূপকথা নয়, নয় কোন গল্প কথা।

এ হল একেবারে সত্যি ঘটনা। আমরা জানি, বাঘ ভাল্লুক সিংহ সাপেরা নির্মম হিংস্রতার মূর্ত প্রতীক। তারা হল অমিত শক্তিশালী, অসম্ভব ধূর্ত, নির্মম নিষ্ঠুর। মানুষ দেখলে হঠাৎ তারা রক্ত লালসায় মেতে ওঠে।

কিন্তু সবাই যে শুধু নরখাদক নয়, তাদের হৃদয়ে লুকিয়ে আছে ভালবাসা-স্নেহ-মমতা, আমরা কজন তার খবর রাখি?

প্রকৃতির আপন সৌন্দর্যে লালিত নিভৃত অরণ্যের বাঘিনীরা কখন হঠাৎ আপন খেয়ালে মানব শিশুকে বুকে তুলে নেয়। তারপর তাকে সযত্নে লালন পালন করে।

তাদের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ খুঁজতে প্রাণী বিজ্ঞানীদের ভাবনার আর অন্ত নেই। কেন তারা হঠাৎ জননী হয়ে ওঠে?

অনেকে বলেন, শাবকের মৃত্যু হলে নেকড়ে মা মানব শিশুর সন্ধান করে। অনেকের মত হল, ওরা নাকি শিশু দেখলে সদয় হয়ে যায়। কারণ যাই হোক, আমরা আসল কথায় আসি।

পৃথিবীর নানা দেশের জঙ্গলে নেকড়ে বালকের অনেক খবর পাওয়া গেছে। তার কয়েকটি আমাদের অবাক করে দেয়। বিশ্ব-বিখ্যাত শিকারীদের রুদ্ধশ্বাস বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে লেখা কয়েকটি কাহিনী এখানে বলা হল। এর প্রতিটি ঘটনা বাস্তব, অতিরঞ্জনের প্রচেষ্টা নেই।

পরিশেষে সংযোজিত হল বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তকের তালিকা, যা উৎসাহী পাঠকের তৃষ্ণা মেটাবে। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের প্রয়াস এই প্রথম। আশা করা যায় নেকড়ে মায়ের মানব শিশু সব বয়সের মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

পৃথ্বীরাজ সেন

উৎসর্গ

শিল্পীবন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী

আর

অপরিচিতা সোমা দেবীকে

॥ এক ॥

সেক্‌স্‌পীয়ারের গল্পে আমরা নেকড়ে বালকের কথা শুনেছি। তাঁর বিখ্যাত বই "উইনটারস টেল"-এ নেকড়ে, ভালুক, দাঁড়কাক ও চিল দ্বারা মানব শিশু পালিত হবার উল্লেখ আছে। আমাদের দেশের গল্পে-গাথায় চিল মায়ের অনেক কাহিনী শোনা যায়।

শুধু গল্পে নয়, ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা নেকড়ে মায়ের খবর পাই।

ইতালীর রাজধানী রোম শহরটি স্থাপন করেন দুই যমজ ভাই — রোমিউলাস ও রেমাস। ভাবতে অবাক লাগে যে, এই দুই ভাইকে মানুষ করেছিল এক নেকড়ে মা।

জন্মের পরে দুই শিশুকে টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হল। [illegible] এক গামলায় পাশাপাশি শুয়ে তারা ভাসতে থাকে টাইবারের অশান্ত জলে। অবশেষে পৌঁছে যায় বনের ধারে।

সেখানে বাস করত এক কাঠুরে। গভীর বনে কাঠ কাঠতে গিয়ে সে হঠাৎ দেখে দুটি শিশু জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে আছে। যেমন ফুটফুটে চেহারা, তেমন সুন্দর মুখ, দেখে তার ভীষণ মায়া হল। সে শিশু দুটিকে তার কুটীরে নিয়ে গেল।

কাঠুরে থাকে একা. দুধ সে কোথায় পাবে? বনের ধারে বাস করতো এক নেকড়ে মা। কাঠুরে গেল তার কাছে। কাঠুরের কথা শুনে নেকড়ে মা বুকের দুধ খাওয়াতে রাজী হল। তারপর সে রোজ আসত আর দুই শিশুকে যত্ন করে দুধ খাওয়াত।

পরবর্তী কালে এরাই অনেক লড়াই করে রোম নগরী স্থাপন করে। এ তো হল কিংবদন্তীর রূপকথা। এবার শোনা যাক সত্যি ঘটনা।

আমাদের ভারতবর্ষে বিচিত্র ঘটনার অভাব নেই। এখানে একাধিক নেকড়ে বালকের খবর মিলেছে।

১৮৪৩ সালে জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির একজন অফিসার মিঃ বল প্রথম নেকড়ে বালকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

তাঁর মুখ থেকে সব কথা শুনে কর্নেল স্লীম্যান নামে সামরিক বাহিনীর এক অফিসার সুন্দর একটি বই লিখে যান। সেই বই থেকে কাহিনীটা এবার শোনা যাক।

হিমালয়ের পাদদেশে ছোট্ট গ্রাম মৌরি। উঁচুনীচু পার্বত্য এলাকা, আশেপাশে ঘন জঙ্গল। এখানে যারা থাকে তারা সবাই বেশ গরীব। ক্ষেতখামারে কাজ করে, কেউ বা যায় দূরের শহরে।

একদিন মিঃ বল বেড়াতে বেরিয়েছেন। আনমনে চলেছেন গ্রাম্য পথে। তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। পাইনের বনে ডুবতে বসেছে সুর্যটা। তিনি হঠাৎ এক স্ত্রীলোকের কান্না শুনতে পেলেন। কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে দেখেন গ্রাম্য কুটীরের সামনে আট-দশ জন লোক কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি জানতে চাইলেন—কি ব্যাপার? মেয়েটি অমন করে কাঁদছে কেন?

ভীড়ের মধ্যে থেকে বেড়িয়ে এল এক মাঝ বয়েসী লোক। বললো—সাহেব, ওর ছোট্ট ছেলেকে নেকড়ে এসে নিয়ে গেছে।

এমন ঘটনা এখানে হামেশাই ঘটে। যে গ্রামে রাতের অন্ধকারে বাঘ এসে হানা দেয় মাটির দাওয়াতে সেখানে এ ব্যাপার তো ঘটতেই পারে।

মিঃ বল কি আর করেন। সান্ত্বনা দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

এরপর কেটে গেছে ছটি বছর। ঐ ঘটনার কথা ভুলেই গেছেন তিনি।

দিনটা ছিল বৃষ্টিভরা। তিনি চলেছেন বিশেষ কাজে। গ্রামের সীমানা পার হয়ে নির্জন রাস্তা ধরে দ্রুত হাঁটছেন মিঃ বল। সঙ্গে চলেছে কয়েকটি গ্রাম্য হাটুরে লোক। তারা অযোধ্যা গড়ের মেলাতে যাবে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। একটু শীত শীত করছে যেন। জঙ্গলের সীমানা সবে মাত্র শুরু হয়েছে।

হঠাৎ কেঁপে উঠল দেবদারু গাছের পাতা। চোখের সামনে এসে দাঁড়াল এক ধাড়ি নেকড়ে। মিঃ বলের থেকে তার দূরত্ব ছ গজের বেশি হবে না।

অরণ্য পথে হাঁটতে হয় বলে তিনি সবসময় সঙ্গে রাইফেল রাখেন।

নেকড়েটাকে দেখে রাইফেলে হাত দিলেন। কিন্তু নেকড়ে কোন শব্দ করল না।

তার এই ব্যবহারে বেশ অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ওদের মত হিংস্র প্রাণী খুব বেশী নেই। মানুষ দেখলেই ওরা চিৎকার করে ওঠে। কি ঘটেছে বোঝার চেষ্টা করলেন মিঃ বল।

একটু বাদে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তিনটে নেকড়ে বাচ্চা। তারপর যে দৃশ্য তিনি দেখলেন সেটা কোনদিন ভুলতে পারবেন না। দেখা গেল নেকড়ে ছানার সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে একটি বাচ্চা ছেলে।

বল সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে গুলী ছুঁড়লেন। বুলেটের শব্দ শুনে নেকড়ের দল চোখের নিমেষে ছুটে পালালো।

তাড়াতাড়ি তিনি এগিয়ে গেলেন ছেলেটির কাছে। মানুষ দেখে ছেলেটি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকল। অনেক কষ্টে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে ধরা হল।

সারা রাত সে ছিল মিঃ বলের কোয়ার্টারে। কিছু খায়নি। থেকে থেকে শুধু জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিয়েছে।

পরদিন সকালে ঘটলো আরেকটা অঘটন। নেকড়ে বালকের কথা গ্রামের সবাই জেনে গেছে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মানুষ তাকে দেখতে এলো। চোখের সামনে এত লোক দেখে সে বেশ বিরক্ত হলো। বড় বড় নখ দিয়ে মাটি কামড়ে তার বিরক্তি প্রকাশের চেষ্টা করল।

হঠাৎ কাছে এসে দাঁড়ালো এক মহিলা। তাকে যেন কোথায় দেখেছেন মিঃ বল, ঠিক মনে পড়ছে না।

অবাক কাণ্ড। সেই মহিলাকে দেখে চুপ করে গেল নেকড়ে-বালক। মহিলা এসে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। তারপরে নীচু হয়ে দেখলো তার বাঁ পায়ের হাঁটুর কাছটা। দেখেই তাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলো।

চোখের সামনে যা ঘটে চলেছে তাতে অবাক হয়ে গেছেন মিঃ বল। গ্রামের একটি লোকের মুখ থেকে পুরো ব্যাপারটা জানা গেল। ছ বছর আগে এই ছেলেটিকে নেকড়ে এসে চুরি করে নিয়ে যায়। ওর হাঁটুতে পোড়া দাগ ছিল। সেই চিহ্নটি দেখে মা ওকে চিনতে পেরেছে।

ছ বছর পরে মা আর ছেলে আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল। এ দৃশ্য দেখে সকলের চোখে আনন্দে জল এসে যায়।

শুধু মিঃ বল চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ভাবছেন, এতগুলো বছর বনে জঙ্গলে কাটাবার পর ছেলেটা কি তার জংলী স্বভাব ছাড়তে পারবে?

চার বছর বাদে একদিন গ্রামের পথে হাঁটছেন তিনি। অনেকক্ষণ ধরে কে যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বারকতক তিনি পেছন ফিরে তাকিয়েছেন কিন্তু কিছুই দেখতে পান নি। এবার তাঁর চোখে পড়ল, বছর দশেকের একটি ছেলে বার বার তাঁকে ডাকছে।

চটপটে স্বভাবের সুন্দর ছেলেটি মিঃ বলকে বললো—সাহেব, আপনি কি আমাকে চিনতে পারেন?

মিঃ বল ভাবলেন যে, হয়তো আশেপাশের গ্রামের কোন চাষীর ছেলে হবে। তিনি কিন্তু তাকে চেনেন না।

ছেলেটি হাঁটুর কাছটা দেখাল। বল দেখলেন সেখানে কালো একটা পোড়া দাগ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সব কথা মনে পড়লো তাঁর। দশ বছর আগে এই ছেলেটিকে নেকড়ে মা চুরি করেছিল। দশ বছরে অনেকটা বদলে গেছে সে। এখন তাকে দেখে কেউ বিশ্বাসই করবে না তার ছোট্ট জীবনের ছ ছটি বছর কাটিয়েছে সে বনেজঙ্গলে। সে যেন ফুটফুটে এক মানব শিশু।

॥ দুই ॥

বন্য জীবজন্তু সম্পর্কে মিঃ বলের দারুণ আগ্রহ ছিল। তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত জঙ্গল দেখেছেন। জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির তরফ থেকে দুর্গম অঞ্চলে নানা অভিযান করেছেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে তিনি ১৮৮০ সালে "জাঙ্গল লাইফ অফ ইণ্ডিয়া" নামে একটি বই লেখেন। এই বইতে অরণ্যের বহু বিচিত্র ঘটনার কথা আছে। যার মধ্যে নেকড়ে বালক হল অন্যতম। সেই বই থেকে কয়েকটি নেকড়ে বালকের গল্প শোনা যাক।

উড়িষ্যার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে মহানদী। তার আশে-পাশে ময়ুরভঞ্জ কেওনঝার পাহাড়ের বিস্তার। সেখানে আছে গভীর জঙ্গল। একবার মার্চ মাসের শেষে মিঃ বল সেই জঙ্গলে এসেছেন। আছেন তাঁবুতে, ঠিক পাশেই বয়ে চলেছে মহানদী।

দুপুর বেলা। বসন্তের নীল আকাশে সাদা মেঘের খেলা। তাঁর সঙ্গে রয়েছে একদল সৈনিক, তারা বন্দুক কাঁধে নিয়ে নদীর পার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ তারা দেখে একটি নেকড়ে তিনটে বাচ্চা আর একটা ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।

ছেলেটাও নেকড়ের মত চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছিল। সৈন্যদের দেখতে পেয়ে তারা সবাই দৌড়ে গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। নেকড়ে দলের মধ্যে মানুষের বাচ্চা চলেছে, ব্যাপারটা ওদের রীতিমত ভাবিয়ে তুললো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা চলল সেই গুহার পাশে।

অনেকক্ষণ ধরে লুকোচুরি খেলার পর ছেলেটা ধরা দেয়। ঐটুকু বাচ্চা হলে কি হবে, গায়ে তার ভীষণ জোর, দু'তিনজন মিলে তাকে ধরে রাখতে পারছে না।

মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে তাকে। মুখের ওপর কম্বল চাপা দেওয়া হয়েছে। কেন না ছেলেটি ঠিক নেকড়ের মত গর্জন করছে। তাই শুনে দূরের জঙ্গল থেকে নেকড়ের দল সাড়া দিচ্ছে। এইভাবে অনেকটা পথ তাকে ওরা টেনে হিঁচড়ে মাটি দিয়ে নিয়ে চললো। সামনে গর্ত বা গুহার মত কিছু দেখতে পেলেই নেকড়ে বালক তার মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিল।

তাকে রাখা হল ক্যাম্পে। প্রথম রাতে সে ভীষণ কান্নাকাটি করে। মাটিতে মুখ চেপে বিকট গর্জন করে ডাকতে থাকে আর মানুষ দেখলেই হাত-পা খেঁচিয়ে তেড়ে যায়।

মিঃ বল খুব কাছ থেকে ছেলেটিকে দেখার সুযোগ পান। তাকে তিনি লোহার খাঁচায় বন্দী করে রাখেন আর সারাদিন ধরে তার বিচিত্র হাবভাব মন দিয়ে দেখতে থাকেন। সুন্দর একটি নামও দেন তার, বন থেকে পাওয়া গেছে বলে তাকে তিনি ডাকতেন বুনো বলে।

বুনো কাঁচা মাংস কচমচ করে চিবিয়ে খেত। হাড় চিবোতে দারুণ ভালবাসতো সে। আমাদের মত হাতে করে তুলে খাবার খেত না। বন্য জন্তুর মত হাতের তালু দিয়ে চেপে রেখে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। খাবার পরে অনেকটা জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত বুনো।

প্রথম প্রথম সে কাউকেই তোয়াক্কা করত না। পরে মিঃ বলকে ভয় পেতে শুরু করে। ছোট ছেলে দেখলেই হাত-পা নেড়ে তেড়ে যেত।

প্রথম প্রথম রাত হলেই জঙ্গলের দিকে মুখ করে নানা রকম আওয়াজ করত বুনো। নেকড়েরা তখনো তার কথার সাড়া দিত। ধীরে ধীরে এ স্বভাবটা চলে যায়।

মিঃ বলের কাছে বুনো ছিল প্রায় একমাস। তারপর তিনি ওকে হোসেনপুরের রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাজপ্রাসাদে দিন পনেরো কাটিয়ে বুনো গেল অযোধ্যারাজের পদাতিক বাহিনীর ক্যাপটেন নিকোলেটের কাছে।

নিকোলেট সাহেব ছিলেন বেপরোয়া প্রকৃতির। নানারকম মজার মজার খেয়াল ছিল তার। হাতের গোড়ায় এমন একটা অদ্ভুত বালককে পেয়ে তিনি যেন মেতে উঠলেন। বুনোর সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেল। ক্যাপটেন তার বন্য স্বভাব বদলাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বুনো কিন্তু কিছুতেই সভ্য হবে না। শুতো সে খোলা মেঝেতে, জামাকাপড় পরতো না, গায়ে কাঁথা চাপা দেওয়া হলে তক্ষুনি সেটা দাঁত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

বন থেকে ধরা পড়ার পর বুনো বেঁচেছিল প্রায় ছ'মাস। ১৮৫০ সালের আগষ্ট মাসে হঠাৎ একদিন সে পেটের অসুখে মারা গেল।

আগের রাতে ক্যাপটেন সাহেব বুনোর সঙ্গে আভাসে ইঙ্গিতে কত গল্প করে গেছেন। তাকে পড়াবেন তিনি, সব ঠিকঠাক। পরের দিন সকালে তিনি দেখলেন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বুনো। দেহে তার প্রাণ নেই। প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মে যে মানবশিশু হয়েছিল নেকড়ে বালক, তাকে অমন করে পড়ে থাকতে দেখে ক্যাপটেন সাহেবের খুব দুঃখ হয়। বুনোকে তিনি সমাধি দিলেন।

ক্যাপটেন নিকোলেটের কাছ থেকে বুনোর মৃত্যু সংবাদ শুনে মিঃ বল দারুণ আঘাত পান। সেদিন তিনি তার ডাইরীতে লেখেন

—এইমাত্র ক্যাপটেন সাহেবের চিঠিটা পেলুম। কদিন আগে হঠাৎ বুনো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন আমি আমার পরম প্রিয় কাউকে হারিয়েছি।

সত্যি, বুনোকে তিনি ভালবাসতেন।

এবার আরেকটি নেকড়ে বালকের অদ্ভুত কাহিনী শোনা যাক।

১৮৫১ সালে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় এই ঘটনাটি লেখা আছে। লিখেছেন রাজকীয় নৌবহরের একজন অফিসার—ক্যাপটেন ফ্রান্সিস এগারটন।

অযোধ্যারাজের দুজন ঘোড় সওয়ার একদিন গোমতী নদীর ধার দিয়ে চলেছে। তখন সন্ধ্যে হবো হবো। চারিদিক বেশ অস্পষ্ট। ছুটতে ছুটতে তারা হঠাৎ দেখতে পেল তিনটি প্রাণী নদীর পাড় বেয়ে জলের ধারে নেমে যাচ্ছে। অন্ধকারে তারা ঠিক বুঝতে পারলো না যে ওরা কোন প্রাণী।

একজন বাজী ধরে বলল—ওগুলো কালো ভাল্লুক। দূর থেকে ছোট লাগছে।

অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে তার কথার প্রতিবাদ করে বলে—আরে দুর দুর, ওরা হল পাহাড়ী কুকুর। হঠাৎ কোন কারণে আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

তারা দুজনে ঠিক করলো স্বচক্ষে গিয়ে সবকিছু দেখে আসবে।

টগবগ করে ছুটলো তারা। প্রাণী তিনটি ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ শুনে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু শিক্ষিত ঘোড়ার সঙ্গে তারা কখনো পারে? কিছুদূর যাবার পর তিনটি প্রাণীকেই ওরা ধরে ফেলে। দেখা যায় কারোর অনুমান ঠিক হয় নি। ভাল্লুক নয়, পাহাড়ী কুকুরও নয়, ওরা হল নেকড়ে শাবক।

তৃতীয় জীবটিকে দেখে দুজনে দারুণ অবাক হয়ে যায়। সে কোন বন্য প্রাণী নয়, সে হল উলঙ্গ একটা ছেলে।

নেকড়ে শিশু দুটিকে ছেড়ে দিল ওরা। ছেলেটাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে চলল লখনউ শহরের দিকে। পালাবার জন্য ছেলেটি চেষ্টার কসুর করেনি। আঁচড়ে কামড়ে সওয়ার দুটিকে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়।

ছেলেটিকে লখনউ চিড়িয়াখানাতে রাখা হল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। চারপায়ে জানোয়ারের মত কনুই ও হাঁটুতে ভর দিয়ে চলাফেরা করত। যার জন্যে কনুই ও হাঁটুতে ঘষা লেগে লেগে কড়া পরে যায়। বেশ কিছুদিন সে ছিল চিড়িয়াখানায়। তাকে দেখার জন্যে বেশ লোক ভীড় করে।

চিড়িয়াখানার ডিরেকটার ছেলেটাকে কথা বলাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু মুখ দিয়ে সে একটি শব্দও বের করতে পারেনি। তবে আকারে ইঙ্গিতে সব বুঝতে পারতো। মুখ দিয়ে নানা শব্দ করে মনের ভাব প্রকাশ করতো। খিদে পেলে হাঁ করে বোঝাতো। রাগ হলে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াত।

॥ তিন ॥

উত্তর প্রদেশের আগ্রা জেলায় সিকান্দ্রায় আছে একটি অনাথ আশ্রম। বয়েসে সে প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো। রেভারেণ্ড এরহার্ড নামে এক দয়ালু বৃটিশ ধর্মযাজক তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় সম্বল করে ঐ অনাথ আশ্রমটি খোলেন।

জায়গাটা ভারী সুন্দর। আশে পাশে মানুষের বসতি নেই। নানা জাতের ফলে ফুলে ঢাকা সবুজ উদ্যানের মধ্যে ছিমছাম একটি বাড়ি। সেখানে থাকে হতভাগ্য ছেলেমেয়েরা যাদের কোন বাবা-মায়ের পরিচয় কেউ জানে না।

সিকান্দ্রার অনাথ আশ্রমে একাধিক নেকড়ে বালক বাস করে গেছে। তাদের মধ্যে দুজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাদের কথাই শোনা যাক।

আগে যে মিঃ বলের কথা বলেছি তিনি ১৮৭২ সালে ঐ আশ্রমে একটি নেকড়ে বালককে দেখেন। তার কথা বেরিয়েছিল দিল্লীর এক খবরের কাগজে। রিপোর্ট পড়ে মিঃ বল হাজির হলেন আগ্রায়। রেভারেণ্ড এরহার্ড তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

আশ্রমের এক তালাবন্ধ ঘরে মিঃ বল ঐ অদ্ভুত দর্শন বালকটিকে দেখতে পান। জানলার লোহার শিকের ওপর সে মাথা ঠুকছিল। মিঃ বল টর্চের আলো ফেললে সে মুখ নীচু করে অন্ধকার কোনে পালিয়ে গেল। এই থেকে তিনি বুঝলেন ছেলেটি এখনো তার বন্য স্বভাব ছাড়তে পারে নি। তাই আলো সে সহ্য করতে পারছে না।

রেভারেণ্ডের মুখ থেকে ছেলেটির সব কথা তিনি জানতে পারেন। ঐ বছর ৬ই মার্চ তারিখে গ্রামের কয়েক জন লোক এসে ওকে আশ্রমে দিয়ে যায়। ওরা জানায় যে ছেলেটিকে ওরা পেয়েছে মৈনপুর অঞ্চলে। দল বেঁধে গ্রামের লোকেরা শিকার করতে গিয়েছিল মৈনপুরে। জঙ্গলের মধ্যে বালকটিকে তারা দেখতে পায়।

তাকে ধরবার চেষ্টা করতেই সে পাশের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সুড়ঙ্গের মত গর্তটা অনেক দূর চলে গেছে। বুদ্ধি করে লোকগুলো তখন সেই গর্তের মুখে দিল আগুন জ্বালিয়ে।

শুকনো ডালপালা জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে, গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। ধোঁয়ার জ্বালায় অস্থির হয়ে ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। তার পেছু পেছু আসে কয়েকটা ধাড়ি নেকড়ে।

এতগুলো লোক দেখে নেকেড়ের দল চম্পট দিল। ছেলেটি পড়ল ধরা। ওকে নিয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে ওরা ওকে দিয়ে গেল এরহার্ডের অনাথ আশ্রমে।

রেভারেণ্ড এরহার্ড মিঃ বলের দিকে তাকিয়ে বললেন—এর বাবা মায়ের খবর আমরা জানি না। কাজেই একে তো অনাথ বলতে পার।

মানুষের মত আকৃতি হলে কি হবে ছেলেটির স্বভাব ছিল একেবারে বন্য জন্তুর মত। শিয়াল কুকুরের মত জিভ দিয়ে চেটে চেটে জল খেত, চুমুক দিয়ে খেতে পারতো না। রান্না করা খাবার দেখলে লাথি মেরে ফেলে দিত সে। কাঁচা মাংস দেখলে সে আনন্দ পেত।

প্রথম প্রথম তাকে আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের দেখে অস্বস্তি বোধ করতো সে। সময় পেলেই মাঠের কোণে চুপচাপ বসে থাকতো।

জামাকাপড় পরতে দিলে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করত। প্রায় বছর ছয়েক সে ছিল অনাথ আশ্রমে। এর পরে হঠাৎ সে খাওয়া দিল বন্ধ করে। রোজ রাতে জ্বর হত তার। জ্বরের মধ্যে করুণ কান্নার মত ডাকতো সে। রেভারেণ্ড নানা ভাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ সাতদিন ছেলেটি কিছুই খায় নি।

অনাহারে মারা গেল মৈনপুরের অদ্ভুত নেকড়ে বালক। আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী তাকে কবর দেওয়া হল। রেভারেণ্ড অবাক হয়ে দেখলেন প্রতিটি ছেলের চোখের কোনে চিকচিক করছে অশ্রু। মনের অজান্তে তারা কখন ঐ ঘরকুনো অসহায় ছেলেটিকে ভালো বেসেছিল!

ঐ আশ্রমে আরেকটি নেকড়ে বালক বছর ছয়েক বাস করে যায়। পরে তার কথা প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর ১৮৭৩ সালের বার্ষিক সংখ্যায়। ঐ সোসাইটির এক ষ্টাফ রিপোর্টার নিজের চোখে সেই ছেলেটিকে দেখে এসেছেন। মৈনপুরের ছেলেটির মত সেও বুনো জন্তুর মত আচরণ করত। অনেক চেষ্টা করে তাকে কথা বলতে শেখানো যায় নি। দাঁতগুলো ছিল শক্ত ও সুচালো। সুযোগ পেলেই মোটা মোটা হাড় কুড়িয়ে নিয়েই দাঁত দিয়ে কামড়াত।

সিকান্দ্রা আশ্রমের আরেকটি নেকড়ে বালক দীর্ঘদিন বেঁচে ছিল। তার বন্য স্বভাবের অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল।

১৮৬৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে বুলন্দসর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ নেকড়ে বালকটির সন্ধান পান। তাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাঠালেন রেভারেণ্ডের আশ্রমে। সেখানে সে বেঁচে ছিল প্রায় দশ বছর।

সে থাকবার সময় মৈনপুরের নেকড়ে বালকটি এসেছিল। আরও দুচার জন বন্য মানব শিশু তার সঙ্গে মিতালী করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে কারো ডাকে সাড়া দেয় নি।

থাকতো সে একপ্রান্তের বড় ঘরে। সামনের বাগানে চার হাত-পায়ে অনবরত পায়চারী করত। স্বভাবটি ছিল যেন রাজার মত। তাই বোধহয় রেভারেণ্ড হেডহার্ড তাকে ডাকতেন বাদশা বলে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চিঠি থেকে তিনি বাদশার অনেক কাহিনী জানতে পারেন। একদিন কয়েকজন লোক এসে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে, সাহেব, বলু সাগরে একটা ভারী অদ্ভুত ঘটনা দেখলাম। আমরা কাঠ আনতে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি। দেখি একটা ছোট ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে। আমাদের দেখে ছেলেটা তাড়াতাড়ি গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। দেখে মনে হয় গর্তটা কোন বুনো জন্তুর হবে। সঙ্গে বন্দুক নেই, তাই আমরা তাকে আর ধাওয়া করি নি।

সব শুনে ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিলেন—যাও আমি কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশকে সঙ্গে দিচ্ছি। যে করেই হোক ছেলেটাকে ধরতেই হবে।

ওরা সদলে চললো নেকড়ে শিশুর সন্ধানে। গর্তের মুখে জ্বালালো শুকনো পাতার আগুন। ধোঁয়ায় ভরে গেল গর্তটা।

একটু বাদে বেশ বড় আকারের একটা নেকড়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গর্জন করতে করতে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে দু একজনকে ক্ষতবিক্ষত করে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে যায়।

নেকড়ে তো গেল, কিন্তু ছেলেটি কোথায়? অনেকক্ষণ বাদে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল সেই নেকড়ে শিশু। তাকে ধরার সময় সে কোন গোলমাল করে নি। মনে হয় সে যেন মনে মনে ঐ দিনটির অপেক্ষা করছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট ছেলেটিকে কিছুদিন রাখলেন নিজের কাছে। হাতের সামনে যা পেত তাই ভেঙে চুরে তছনছ করে দিত সে। কাঁচা মাংস ছাড়া আর কিছু খেত না। খাড়া হয়ে চলতে পারতো না সে।

নিজের কাছে রাখতে অসুবিধা হওয়ায় ওকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন সিকান্দ্রার আশ্রমে।

দেখতে দেখতে বাদশা বেশ বড় হয়ে গেল। যখন সে আসে তখন তার বয়েস বছর চারেকের বেশী ছিল না। এখন সে হয়েছে দশ বছরের বালক।

ইতিমধ্যে একদিন মারা গেলেন রেভারেণ্ড এরহার্ড। বাদশা রেভারেণ্ডের মৃতদেহের পাশে সারারাত দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হয় সে যেন তাকে পাহারা দিচ্ছে।

এরহার্ডের মৃত্যুর পর লিউলিস নামে আর এক রেভারেণ্ড এলেন ঐ আশ্রমে। ১৮৮৫ সালের আশ্রমের বার্ষিক রিপোর্টে তিনি বাদশার কথা লিখে গেছেন। এরহার্ডের মৃত্যুর পর মাত্র কয়েক মাস বেঁচে ছিল সে। সেই সময়টুকুতে তার স্বভাবের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়। কথা সে বলতে শেখেনি সত্যি, তবে মনের ভাব প্রকাশ করতে মুখ দিয়ে নানা শব্দ করত। কাঁচা মাংসের পরিবর্তে ঝলসানো মাংস চাইতো, এমন কি মশলাপাতি দিয়ে রান্না করা মাংস খেতেও মন্দ লাগতো না তার।

শেষের দিকে বাদশা চুরুট খাওয়া ধরে। সে এক মজার দৃশ্য। মেঝের ওপর বসেছে বাদশা, ঠোঁটে ঝুলছে চুরুট, হাতে মাংসের বাটি।

বাদশাকে সভ্য করার জন্যে এরহার্ডের চেষ্টার অন্ত ছিল না। যদি তিনি এই দৃশ্যটি দেখতে পেতেন?

বাদশার আরেকটি স্বভাব আমাদের অবাক করিয়ে দেয়। চুরুট ফুরিয়ে গেলে সে হাত পেতে পয়সা চাইতো।

রিপোর্টের শেষে লিউলিস মন্তব্য করেছেন—আর কিছুদিন বাঁচলে বাদশাকে আমরা পুরোপুরি সভ্য করে তুলতুম। আমাদের দুর্ভাগ্য, মৃত্যু সে সুযোগ দিল না।

১৮৯৩ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হল একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ।

খবরটি হল এইরকম—বিহার প্রদেশের ভাগলপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে একটি নেকড়ে শিশু ধরা পড়েছে। ঐ গ্রামের জমিদার ভগলু সিং জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সারাদিন ছুটোছুটির পর তিনি একদল বুনো শুয়োরের সন্ধান পান।

যখন বন্দুক তুলে শুয়োরের ওপর তাক করছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান তার পেছনে মানুষের মত দেখতে একটি জীব যেন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

সেই দেখে তিনি আর গুলি ছুড়লেন না। ঝোপটা ঘিরে ফেলার জন্মে অনুচরদের আদেশ দিলেন। শুরু হল খোঁজাখুঁজি। অনেকক্ষণ বাদে যাকে পাওয়া গেল সে কোন বুনো জন্তু নয়।

সে হল বছর চোদ্দ বয়েসের একটি উলঙ্গ ছেলে। জমিদার বাবু তাকে রাখলেন তাঁর কাছারি বাড়ীতে। ছেলেটি কথা বলতে বা বুঝতে পারতো না, রান্না করা খাবার খেতো না। খেতো কাঁচা মাংস আর মাছ। জ্যান্ত ব্যাঙ দেখতে পেলেই খপ করে ধরে মুখে পুরে দিত।

এই ছেলেটির শেষ পরিণতি কি হয় সে খবর আমরা জানতে পারি নি।

॥ চার ॥

এবার বলি রামুর কথা। যাকে নিয়ে শুধু ভারতে নয়; সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। কেননা রামু বেঁচে ছিল প্রায় চোদ্দ বছর, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন নেকড়ে বালক এতদিন বাঁচেনি।

লখনউ স্টেশন।

তখন সবে ভোর হয়েছে।

জানুয়ারী মাসের হাড় কাঁপানো বাতাস বইছে। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে দিল্লীগামী একটি রেল।

রোজকার নিয়মমত রেল জমাদার হরিপ্রসাদ কামরা পরিষ্কার করতে এসেছে। মাথায় টুপী, কান ঢাকা মাফলারে। তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরার সামনে এসে থমকে গেল সে। দেখলো স্লিপারের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে—কি এক অদ্ভুত আকৃতির জন্তু।

দেখে মনে হয় বুঝি মানুষের বাচ্চা। অথচ হাতে পায়ে বড় বড় নখ। সারা দেহে বড় বড় লোম। চোখের ওপর আলো পড়ায় সে দুহাতে মুখ ঢাকলো।

শীতের সকালে এই অদ্ভুত জীবটাকে দেখে হরিপ্রসাদ ঘামতে শুরু করে।

ঝাড়ু ফেলে দিয়ে সে ছুটলো রেল পুলিশ সরযুর কাছে। ওরা দুজনে মিলে জন্তুটাকে ধরে ফেললো।

তাকে পাঠানো হলো বলরামপুরের হাসপাতালে। সেখানকার ডাক্তারবাবুরা তার নাম দিলেন রামু।

তখন তার বয়স ছিল চোদ্দ বছর, ১৯৬৮ সালে সে যখন মারা যায় তখন সে ২৮ বছরের যুবক।

অন্য ঘটনাগুলোর সঙ্গে রামুর ঘটনার অনেক পার্থক্য আছে।

কেন না আগে আমরা দেখেছি নেকড়ে বালকদের পাওয়া গেছে গুহা থেকে। কিন্তু রামুকে পাওয়া যায় ট্রেনের কামরাতে।

তাই মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি সে নেকড়ে মায়ের দ্বারা প্রতিপালিত বালক? না কি কোন সাধারণ গ্রাম্য ছেলে?

যদি সে নেকড়ে বালক হয় তবে ওখানে এলো কি করে?

এইসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে বসলেন বলরামপুর হাসপাতালের ডাক্তাররা। ধীরে ধীরে রামুর কথা ছড়িয়ে পড়ল দেশ বিদেশে। ইউরোপের নানা দেশ থেকে শিকারীরা এলেন রামুর সঙ্গে আলাপ করতে।

তার আকৃতি দেখে সবাই তাকে নেকড়ে বালক বলে সনাক্ত করেন।

স্বভাবটাই ছিল বুনো জন্তুর মত। কুকুর, বেড়াল আর ভাল্লুকের সঙ্গে খেলা করতে ভালোবাসতো। সবচেয়ে আনন্দ পেত একদল নেকড়ে ছানার সঙ্গে খেলতে।

রামুকে রাখা হয় প্রাকৃতিক পরিবেশে। চারপাশে কৃত্রিম জঙ্গল তৈরী করা হল। তার মধ্যে ছিল একটি জলাশয়। ইঁটের টুকরো দিয়ে পাহাড় গড়ে গুহা সৃষ্টি করা হয়।

মাঝে মাঝে সেখানে নেকড়ে শিশুকে ছেড়ে দেওয়া হত। ওদের পেয়ে সারাদিন মনের আনন্দে ছুটোছুটি করে খেলা করত রামু।

তাকে দেখে মনে হত সে যেন আবার ফিরে গেছে তার বন্য জীবনে।

একা থাকার সময়ে রামু বিশেষ চলাফেরা করত না। গুহার মধ্যে চুপ করে বসে থাকতো।

তার হাত ও পায়ের তেলোগুলো এমন আকার ধারণ করে যেন নেকড়ের থাবা। এর থেকে প্রমাণিত হয় রামু অনেকদিন নেকড়ে মায়ের আশ্রয়ে কাটিয়েছে।

দাঁত ছিল তার বড় বড়। চেটে চেটে জল খেত। হাত দিয়ে

ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত মাংস। বিরক্ত হলে মাথা তুলে নেকড়ের ভঙ্গিমায় চীৎকার করত।

সভ্য মানুষের মধ্যে থাকতে থাকতে রামুর স্বভাবের অনেক পরিবর্তন হয়। তাকে নিয়মিতভাবে লেখাপড়া শেখানো হত। শেষের দিকে সে কয়েকটি বর্ণ শিখে ফেলে।

মুখ দিয়ে মানুষের বাচ্চার মত আওয়াজ করত। যার মধ্যে দু একটি অস্পষ্ট কথার আভাস পাওয়া যায়।

সবদিক বিচার করে বলা যায়, নেকড়ে বালকদেব মধ্যে একমাত্র রামুই সভ্য হবার চেষ্টা করেছিল।

॥ পাঁচ ॥

এই কাহিনীর পটভূমি মালয় দেশের দুর্গম রবার অরণ্য। উত্তরের আমুর নদীর অববাহিকা থেকে শুরু করে দক্ষিণের বালি দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আছে ঐ রবার অরণ্য। যেখানে বাস করে এক বর্ণ উজ্জ্বল আশ্চর্য সুন্দর পশু, বাঘ। আর আছে হিংস্র কালো চিতা।

কেলানটানের জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে গিয়ে ছিলেম ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত শিকারী ক্যাপটেন বার্ক। জীবনে তিনি অনেক বাঘ শিকার করেছেন। ভারত এবং শ্রীলঙ্কার জঙ্গলে ঘুরেছেন, শিকারে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা।

কিন্তু মালয় অরণ্যে শিকার করতে গিয়ে ক্যাপটেন বার্ক যে দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন সেটা তাঁর শিকারী জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নরখাদকের সন্ধানে এসে ক্যাপটেন বার্ক নেকড়ে মার সন্ধান পান।

শুধু সন্ধান নয়, অসীম সাহসে ভর করে তিনি দীর্ঘ ছ'মাস ধরে সেই নেকড়ে মাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেন।

সঙ্গে ছিল টেলিফটো লেন্স ক্যামেরা। যার সাহায্যে কয়েক ডজন দুষ্প্রাপ্য ছবি তুলে এনেছেন। সেই ছবিগুলো দেখলে নেকড়ে মায়ের বিচিত্র অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

তারাও যে মানুষ মায়ের মত বাচ্চাকে আদর করে ঘুম পাড়ায়, গালে গাল ঘষে সাহস যোগায়—তার পরিচয় পাওয়া যায় ক্যাপটেন বার্কের দুষ্প্রাপ্য অ্যালবামে।

সেই বিচিত্র সুন্দর ঘটনাটি তাঁর ভাষায় বলা হল।

১৯৭৪ সালের শুরুতে আমি মালাক্কার অরণ্যে পা রাখি। মালয়ের বিস্তৃত অরণ্য চিরদিন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তাই এখানে এসে অনেকদিনের স্বপ্নটা সফল হল। মালয়ের অরণ্যের সৌন্দর্য্য দেখলে শিকারের কথা মনে পড়ে না।

রবার গাছে পাতা নেই। বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতের ধারে ঘন অরণ্যানীর গহন গভীরে সুন্দর পশুরা আপন খেয়াল খুশীতে ঘুরে বেড়ায়।

বাঘ আর চিতা ছাড়া এখানে আছে খরগোস, মেঠো ইঁদুর, হরিণ, বুনো শুয়োর, ময়ুর, আর মুরগী।

গোটা জানুয়ারী মাসটা কেটে গেল নেহাৎ উপত্যকার অরণ্যে ঘুরে ঘুরে। কেরত—ইজাল—কেমাসেক প্রভৃতি অঞ্চলের রবার অরণ্যের সঙ্গে হল আমার গভীর বন্ধুত্ব। আমি জানি এর আশে পাশে আছে বাঘের আস্তানা। যেখানে সে দলবদ্ধ ভাবে বাস করে।

ফেব্রুয়ারীর শুরু থেকে শিকারে মন দিলুম। দিন ধরে একটা মানুষখেকো বাঘিনীর পেছনে তাড়া করে চলেছি। যে কোন মুহূর্তে সেটা আমার রাইফেলের নিশানার মধ্যে চলে আসবে।

অবশেষে এল ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর রাত। পেনাং অরণ্যে জ্যোৎস্না

নেমেছে চোরের মত পা টিপে টিপে। রবার গাছে মাচা বাঁধা যায় না। কোন রকমে উঠে বসেছি আমি।

রাতের বয়েস বাড়ছে। ঘন পত্র পল্লবে ঢাকা নিভৃত জায়গায় শোয়ানো আছে বুনো মোষ। যার সন্ধানে মানুষখেকো এখানে আসবে।

প্রায় শেষ রাতে বাঘটাকে দেখতে পেলুম। মাথা নীচু করে মোষের মাংস খাচ্ছে। বন্দুক তুলে গুলী করতে যাব হঠাৎ পাতার মধ্যে খসখস শব্দ শুনতে পাই।

ঘাড় শক্ত করে দেখি ঠিক সামনে দিয়ে ছুটে চলেছে একপাল কালো নেকড়ে। দেখে মনে হয় কোন কারণে তারা ভীষণ ভয় পেয়েছে।

অবাক হয়ে আমি দেখি তাদের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে দুটি মানব শিশু।

জীবনের সাতাশটা বছর অরণ্য অভিসারে কেটে গেছে। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি।

নির্জন বনে নরখাদক বাঘের সামনে হিংস্র নেকড়ের সঙ্গে দুটি মানব শিশুকে হাঁটতে দেখে আমি এমন অবাক হয়ে যাই যে গুলী করার কথা ভুলেই গেলুম।

মানুষেয় গায়ের গন্ধে উন্মত্ত বাঘটা মাথা তুলে একবার তাকাল। বয়েসের ভারে ক্লান্ত এক বিবর্ণ বাঘ। মুখ দেখে মনে হয় যেন তুষার দিয়ে গড়া।

ছেলে দুটির কথা ভেবে বুলেট ছুঁড়ি। মাত্র একটি গুলীতে শেষ হল বাঘের অশান্ত জীবন।

কিন্তু গুলীর শব্দে নেকড়ের দল পালালো চোখের আড়ালে। তাদের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে শিশুদুটি নেমে গেল গাছের নীচে। আমরা মাচা থেকে নেমে এসে যেই তাদের কাছে গেলুম সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ছুটে এল এক পূর্ণ বয়স্ক নেকড়ে।

আর একটু হলে সে আমার কাঁধে থাবা মারতো। ঠিক সময়ে আমি বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাকে আঘাত করি।

নেকড়ে জননী তাতে বিন্দুমাত্র দমলো না। সে বিকটভাবে গর্জন করতে করতে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি প্রত্যক্ষ করলুম, নেকড়ে জননীর বিচিত্র মাতৃত্ব। আমাকে ব্যস্ত রেখে সে বাচ্চা দুটিকে পালাবার পথ করে দিল।

ঐ ঘটনায় আমি অল্পবিস্তর আহত হই। কিন্তু আমার জেদ বেড়ে যায়। যে নেকড়ে জননী নিজের জীবন বিপন্ন করে বাচ্চাদের প্রাণ বাঁচায় তার কথা আমাকে জানতেই হবে।

কদিন বাদে শুরু হল আমার অনুসন্ধান। এতদিন বন্দুক কাঁধে হিংস্র নরখাদকের সন্ধান করেছি। সেই অভিযানের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড উত্তেজনা। এই প্রথম আমাকে নেকড়ে জননীর খোঁজে বেরোতে হল।

এ এক অদ্ভুত অভিযান। মনের মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। বুনো জন্তু দেখলে রাইফেল তুলে নিচ্ছি। কেননা আমার উদ্দেশ্য হল এক অদ্ভুত ঘটনা সম্পর্কে জানা। বেঁচে থাকলে আবার শিকারী হতে পারবো। কিন্তু এই সুযোগ আর পাবো না।

পুরো দিনটা কেটে গেল বৃথা অন্বেষণে। মালয় অরণ্যের বৈশিষ্ট্য হল তার জলে ভেজা মাটি। যেখানে সব জন্তুর পায়ের ছাপ পড়ে। যাদের গড়ন ও নখের আকৃতি দেখে জন্তুকে সনাক্ত করা যায়।

আমার অভিজ্ঞ চোখ বলে কাছে পিঠে কোথাও আছে নেকড়ের আস্তানা। কিন্তু সারাদিনে তারা একবারও চোখের সামনে আসেনি।

দেখা মিলল অভাবিত ভাবে।

পুরো তিনটি দিন কেটে গেছে। সন্ধ্যে নেমেছে। আকাশ থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে ঝোড়ো হাওয়া। সমুদ্রের ফেনা পাখীর মত উড়ছে বাতাসে।

সেই দুর্যোগের রাতে বুনো জন্তুর দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

হ্যাজাক জ্বলছে। পরাজয়ের ক্লান্তিতে আমি ইজিচেয়ারে বসে আছি।

চোখের সামনে চলমান ছায়ার মত কি যেন সরে গেল। সহসা মনে হল সে বুঝি ঐ আকাঙ্ক্ষিত নেকড়ে মা। তাড়াতাড়ি টর্চের আলো ফেললাম। একেবারে চোখের ওপর আলো পড়াতে যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বুনো জন্তুটা।

তাকে দেখে আনন্দ আর ধরে না। বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে জীবনকে বাজি রেখে আমি যার সন্ধান করছি। এ হল সেই নেকড়ে জননী।

টর্চের আলোটা জ্বেলে রেখে তার সামনে এগিয়ে গেলুম। দেখি পেটের নীচের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে আছে এক মানব শিশু। নেকড়ে মা তাকে বৃষ্টির ছাঁট থেকে রক্ষা করছে।

আমাকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে সে বাচ্চাকে মুখে তুলে নিয়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাছে এমন দুর্লভ সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যায় সেই ভেবে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে আমি ছুটলুম তার পেছনে।

তাঁবুর সামনে পথ এঁকে বেঁকে পাহাড়ের সানুদেশে উঠে গেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে ঠিকমত হাঁটতে পারছি না। নেকড়ের সঙ্গে কি পাল্লা দেওয়া যায়? বড় বড় লাফ মেরে সে পার হল পাহাড়ী খাদ। যাক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, নেকড়ে মা থাকে ঐ পাহাড়ের মাথায়।

ওখানকার গুহাগুলোয় হানা দিলে তার সন্ধান মিলবেই:

মনে আশা নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। সারা রাত ধরে চললো বৃষ্টি। ভোরের দিকে সেটা পরিণত হল ছোট ছোট ফোঁটায়।

আমি যেন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে রাজী নই। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে ছুটলুম পাহাড়ের দিকে।

সারারাত ধরে বৃষ্টি হওয়াতে পাহাড়ের পথ বেশ পিছল। গাছের

পাতা থেকে তখনো টুপটাপ ঝরছে জলকণা। সাবধানে আমরা পা টিপে টিপে এগোচ্ছি। যদি নেকড়ে মা আমাদের পায়ের শব্দ পায় তাহলে গুহার গভীরে চলে যাবে।

পাহাড়টা যেখানে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে তার গভীর এক খাদের মাথায় আড়াআড়ি দুটো পাথরের আড়ালে রয়েছে এক মস্ত গুহা।

আমরা টর্চ জ্বেলে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ি। আমার ও জনের হাতে রয়েছে উদ্যত রাইফেল। মাতৃস্নেহে অন্ধ নেকড়ে মা যদি হঠাৎ আক্রমণ করে তাহলে কি হবে।

জনকে বলেছি ও যেন কিছুতেই গুলী না করে।

না, এখানে জন্তুর আস্তানা নেই। গুহা থেকে বেরিয়ে আসি। তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাই সামনে। আরেকটু উঁচুতে পাহাড়টা খাড়াভাবে উপরে উঠে গেছে। ঠিক যেখানে রয়েছে পাঁচ ফুট গভীর বিরাট এক গর্ত।

টর্চের আলো ফেলতেই দেখি ঠিক যেন আমার পায়ের নীচে তীব্র আলোর দ্যুতি অন্ধকার ফুঁড়ে জ্বলজ্বল করছে।

ক্লাইভকে বাহবা দেব। সামান্য সুযোগে সে ইলেকট্রনিক ক্যামেরায় ধরে রাখলো নেকড়ে মায়ের বিরল ছবি। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চোখে বিরক্তি এনে সে ভয় মেশানো বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে টর্চের আলোর দিকে।

তাকে দেখে মনে হয় সে বুঝি বলতে চায়—আবার এখানে এলে কেন?

এই অবস্থায় পড়লে মানবী মাও কি সেই কথাই বলতো না?

তখনকার মত কৌতুহল মিটে গেল। তিন বন্ধু ফিরে এলুম তাঁবুতে। আজ রাতে আবার বেরোতে হবে।

নিঝুম রাত্রি জুড়ে ঝিঁঝিঁর ডাক শুরু হল। রাত জাগা পাখীর ডানার ডানায় বেজে উঠল অদ্ভুত সিমফনি। আমরা চললুম নেকড়ে মায়ের গুহায়?

আকাশে উঠেছে ক্ষীণ চাঁদ। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। কালো মেঘের কোন চিহ্ন নেই।

নেকড়ে জননী দারুণ চালাক। আমরা আবার আসতে পারি এইভেবে গুহা থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। তার মানে আবার তাকে অনুসন্ধান করতে হবে।

পাথরের ওপর পায়ের দাগ দেখে হামাগুড়ি দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। পাহাড়টা শেষ হয়ে শুরু হয়েছে দীর্ঘ উপত্যকা।

বেশীদূর যেতে হল না। ওবার বাগিচার মধ্যে নেকড়ে মায়ের সুখী পরিবার দেখতে পেলুম।*

দু'তিন ফুটের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার বুকের দুধ খাচ্ছে চারটি শিশু। যার মধ্যে দুজন হল মানুষের সন্তান।

জন্তুর সঙ্গে মানুষের এই বিচিত্র বন্ধুত্বের খবর আগে শুনিনি।

টর্চটা নিভিয়ে দিলুম। জ্যোৎস্নার আলোয় ভারি শান্ত লাগছে অরণ্যের হিংস্র কালো নেকড়েকে। তার চোখে মুখে কোথাও নেই হিংসার উন্মত্ততা। তার বদলে সেখানে ফুটেছে মায়ের স্নেহ।

ক্লাইভের ক্যামেরা বার বার ঝলসে ওঠে। নেকড়ে মায়ের মায়াবী মুখের ছবি ধরা পড়ে। ভবিষ্যতে যাকে নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ হয়েছিল। শিকারীরা সবাই বন্য পশুর বীভৎস ছবি তোলেন। হাঁ করে গর্জন করছে থাবা তুলে লাফ দিতে উদ্যত, অথবা শিকার দেখে লক্ লক্ করছে জিভ—এই সব আর কি।

এই প্রথম বুনো জন্তুর অন্য রকম ছবি তোলা হল।

সুরু হল আমার অদ্ভুত নেশা। দিনে রাতে সকালে বিকেলে বসন্তে শীতে সেই নেকড়ে জননী যেন আমাকে দুর্বোধ্য ভাষায় আমন্ত্রণ জানালো। আমিও শিকারের কথা ভুলে সাড়া দিলুম তার ডাকে।

আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে দিনগুলো মন্দ ছিল না। এমনভাবে উন্মাদের মত ছুটে না গেলে কত অভাবিত দৃশ্য দেখতে পেতুম না।

আমি দেখেছি পাতা খসার মৃদু শব্দ শুনে নেকড়ে মায়ের চোখে কেমন ভাবে ভয় এসে বাসা বাঁধে। আমি শুনেছি গভীর রাতে নর-খাদকের হুঙ্কার শুনে সে আকুল হয়ে ডাকে তার বাচ্চাদের। তার কি কোন তুলনা আছে ?

দিনে দিনে আমার সঙ্গে ভাব হল তার।

সে বুঝলো আমরা তার শত্রু নই, বরং আমাকে সে বন্ধু হিসেবে নিতে পারে।

সত্যি সত্যি আমাদের মধ্যে গড়ে উঠলো অপূর্ব বন্ধুত্ব।

এখানে এসেছিলুম মার্চে, তারপর বিশ্রী বর্ষাকালটা কেটে শরৎ এসে গেল। টেবিলের ওপর পড়ে আছে—মালয় অরণ্যের ম্যাপ, যে কাজের জন্যে আমি এসেছি তার কিছুই শেষ করতে পারিনি। ঐ ভয়ঙ্কর সুন্দর বিনজাই কুকাই জোহর জঙ্গলে আমার পদচিহ্ন আঁকা হবে না। এখানে আমি বেশ ভালোই আছি।

সব কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলুম। লিখলুম শারীরিক কারণে আমি বাঘ শিকারে যেতে পারছি না। তিনি যেন অন্য কোন উপযুক্ত শিকারীকে পাঠিয়ে দেন।

বাচ্চা দুটো খেলতে খেলতে একা একদিন তাঁবুর মধ্যে এসে পড়ে। গায়ে ধুলোবালি, হাতে পায়ে বড় বড় নখ, মাথায় রুক্ষ শুকনো চুলের জটা। দেখে মনে হয় আহা! কার ছেলে কে জানে, কি ভাবে বড় হচ্ছে।

যদি ওদের হারানো বাবা মাকে খুঁজে পাওয়া যায়, সেই আশায় জনকে পাঠালুম আশেপাশের গ্রামে। অন্তত: পঁচিশজন মা কাঁদতে কাঁদতে শোনাল তাদের ছেলে হারানোর কাহিনী। তাদের সবাইকে আমি এখানে হাজির করি। কিন্তু ঐ অদ্ভুত দর্শন নেকড়ে শিশু দুটিকে ছেলে বলে স্বীকার করতে কেউই রাজী হয়নি।

শুধু আঠারো কুড়ি বছর বয়সের এক তরুণী মা একটি শিশুকে কোলে নেয়।

সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে শিশুটি বড় বড় নখ দিয়ে মেয়েটির মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে দিল।

আমি ভাবলুম, যারা হারিয়ে গেছে তাদের কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? তার চেয়ে এরা না হয় বড় হোক নেকড়ে মায়ের কোলে।

দেশ থেকে চিঠি এসেছে, আমাকে এবার ফিরতে হবে।

আমরা ফিরবো সে খবর যেন পৌঁছে গেছে শিশু দুটির কানে। কদিন ধরে তারা আর আসছে না। কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। অথচ ফিরতে আমাদের হবেই।

সেদিন ছিল শুক্লা চতুর্থী। শীত আসছে। সন্ধ্যে হতে না হতেই চাঁদ ঢলে পড়লো আকাশে। পাতা খসার মৃদু মূর্ছনা শুনতে শুনতে আমরা ক্ষুণ্ণ মনে চলেছি নেকড়ে জননীর সন্ধানে।

যেখানে প্রথম তাদের দেখি সেই পাহাড়ের পথ বেয়ে আনমনে হাঁটছি আমরা।

হঠাৎ পাশের কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই দুই মানব শিশু। আমি তাদের নাম রেখেছি জিক আর জ্যাক। কি যেন মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে চায় আমাদের।

তাদের অনুসরণ করে হাজির হই পাহাড়ী গুহায়। শুনতে পাই এক কাতর আর্তনাদ। বদ্ধ বাতাসে প্রতিফলিত হচ্ছে মুমূর্ষু নেকড়ে জননীর কান্না।

টর্চের আলো ফেলতেই আমরা শিউরে উঠি। নেকড়ে মায়ের দেহের সর্বত্র রক্ত ঝরছে। চোয়াল ভেঙে গেছে তার। কপালে কাটা দাগ। মাটিতে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে।

বুঝতে পারি, শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছিল সে। তারপর কোন হিংস্র জন্তুর আঘাতে জখম হয়েছে।

তাকে দেখে বোঝা যায় আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। হয়তো বা ভোর হবার আগেই মারা যাবে সে।

সে রাতটুকু ওখানে কাটিয়ে দিলুম। ক্লাইভের ক্যামেরা ধরে রাখলো মৃত্যু কাতর মুখের প্রতিচ্ছবি।

পুবের আকাশ রাঙিয়ে সূর্য ওঠার প্রাক মুহূর্তে শেষবারের মতো আর্তনাদ করে ঢলে পড়লো নেকড়ে জননী।

মায়ের মৃত্যু হলে আমরা যেমন কাঁদি, ঠিক তেমনি ভাবে কাঁদবার চেষ্টা করছে জিক আর জ্যাক।

ওদের রেখে এলাম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে, এখন ওরা সত্যিই অনাথ হল।

পাহাড়ী পথে ফিরে চলেছি, সূর্যটা ধীরে ধীরে জেগে উঠল চোখের ওপর। ক্লাইভের কাঁধে ক্যামেরা, তাতে ধরা রইলো অনেক স্মৃতি। জনের কাঁধে বন্দুক, এই প্রথম সেটা কোন কাজে লাগল না।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লাইভ বললো—ক্যাপ্টেন, জিক আর জ্যাককে সঙ্গে নিলে কেমন হয়?

আমি বললুম—বন্যেরা বনেই সুন্দর। যেমন শিশুরা সুন্দর মায়ের কোলে।

এরপর কেটে গেছে কয়েকটি মাস। আজও মাঝে মাঝে মনে হয় জিক আর জ্যাককে হিংস্র নরখাদকের মধ্যে রেখে এসে আমি কি ভুল করেছি।

ফেরবার সময় জীপ দুর্ঘটনায় দারুণ আহত হই। একটা পা প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছে। এ জীবনে হয়তো কখনো জঙ্গলে যেতে পারবো না।

যখনই কেউ মালয়ের জঙ্গলে যায় তাকে বলি—বন্ধু, যদি পার পেনাং অরণ্যে আমার জিক আর জ্যাককে একবার দেখে এসো।

পরক্ষণেই মনে হয় তারা কি আর এতদিন বেঁচে আছে?

॥ ছয় ॥

শহরটার নাম আদ্দিস আবাবা।

শহরের মানুষগুলো ছুটে চলেছে দি গ্রেট সাফারি সার্কাসের তাঁবুতে।

না, জীব জন্তুর আকর্ষণে ওরা সার্কাস দেখতে আসে নি। কেননা আফ্রিকার মানুষের কাছে বুনো জন্তুর টান বেশী নেই। ছোটবেলা থেকে তারা শুনতে পায় হিংস্র জন্তুর হাঁক ডাক। চোখের সামনে দেখেও ফেলে।

ওরা এসেছে লুসির ডাকে।

লুসি কে? সার্কাসের কোন ক্লাউন? না কি সে ট্রাপিজের খেলা দেখায়।

না, সে হল নেকড়ে মায়ের পালিতা কন্যা। এ পর্যন্ত আমরা নেকড়ে বালকের বিচিত্র খবর শুনেছি। এই প্রথম শুনবো নেকড়ে মেয়ের কথা।

বয়সে লুসি বছর ছয়েকের হবে। এককালে রঙটা ছিল দুধের মত সাদা, আজ হয়েছে রোদে পোড়া তামাটে। জন্তুর মত গোঁ গোঁ শব্দ করে। থালা থেকে চেটে চেটে জল খায়। তবু নেকড়ে বালকদের তুলনায় সে বেশ সভ্যভব্য।

তা হবে না কেন? সার্কাসের মালিক পল লুসিকে কেনে বছর দুয়েক আগে। নুরু নামে স্থানীয় শিকারী তিনশো টাকার বিনিময়ে তাকে বিক্রী করে দেয়। তখন সে ছিল আরো ছোট। হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটত আর ভাষাহীন চোখে তাকিয়ে থাকতো।

পলের শাসনে লুসি অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। অবশ্য সে এখনো কাঁচা মাংস খায়। মুখ দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ করে।

দর্শকেরা অবাক হয়ে লুসির খেলা দেখে। হামাগুড়ি দিয়ে সে হেঁটে যায় কাঁচের টিউবের মধ্যে। টিউবটা কিন্তু ভাঙ্গে না। এছাড়া নানারকম মজার মজার খেলা দেখায় লুসি।

সেদিন কৌতুহল বশে সি পেট্রিক নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানী সাফারী সার্কাস দেখতে গেলেন।

লুসির কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। চোখের সামনে তাকে দেখে বেশ ভাল লাগে তার। পেট্রিক সাহেবের অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল নেকড়ে শিশুদের নিয়ে গবেষণা করবেন। বলা যায় সেই কারণে তিনি এসেছেন আফ্রিকায়।

পলতো কিছুতেই লুসিকে ছাড়বে না। অবশেষে হাজার টাকার লোভ দেখাতে সে রাজী হল।

পলকে ছেড়ে যাবার পর লুসির মধ্যে পুরোনো বুনো স্বভাবটা ফিরে আসে। তাকে নিয়ে পেট্রিক পড়লেন মহা সমস্যায়।

সে ছিল সাজানো ঘরে। চুপ করে বসেছিল মেঝেতে। ঘণ্টা-খানেক বাদে ফিরে এসে পেট্রিক দেখেন ঘরে যেন প্রলয় ঘটে গেছে। টেবিল চেয়ার ওলটানো, আয়নার কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আছে। বিছানা বালিশ ছিঁড়ে তুলো বেরিয়ে পড়েছে।

তার মধ্যে বসে লুসি মুখে হাতের তালু চাপা দিয়ে বিচিত্র শব্দ করছে।

এমনভাবে বেশ কটা দিন কেটে গেল। লুসি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পেট্রিক পড়লেন মহা চিন্তায়।

তাঁর গবেষণা বুঝি মাঠে মারা যায়। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি একটা উপায় বের করলেন। পলের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে হাজির হলেন মুরুর কাছে। লুসির কাহিনী জানতে হলে মুরুর সাহায্য নিতেই হবে।

মুরু বললো তার বাস্তব অভিজ্ঞতার বিচিত্র কথা।

থাকে সে রুডলফ হ্রদের পাশের গ্রামে। মাঝে মাঝে খেয়াল

খুশীতে বন্দুক কাঁধে শিকারে বেরোয়। সেবার একাই চলেছে। জঙ্গল যেখানে খুব ঘন নয়, ঠিক সেখানে ঠাণ্ডা ছায়াঘন বনবীথির তলায় সে দেখতে পেল লুসিকে। মেয়েটা হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে গভীর জঙ্গলের দিকে চলেছে।

মুরু সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে গেল। ও যদি একবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ধরা দেবার সময় লুসি কিন্তু কোন বাধা দিল না। বেশ শান্ত ভাবে নিজেকে মুরুর হাতে সমর্পণ করলো। সেই কথা শুনে পেট্রিক বুঝতে পারলেন যে জন্ম থেকে লুসি জঙ্গলে মানুষ হয়নি। কয়েক বছর বাবা মায়ের কাছে থাকবার পর সে হঠাৎ হারিয়ে যায়।

মুরুর কাছ থেকে বিদায় নেবার পরে পেট্রিকের মনে নতুন ভাবনা এল। তিনি ভাবলেন, লুসিকে তার বাবা মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলে কেমন হয়?

গায়ের রঙ দেখে বোঝা যায় লুসির বাবা মা বিদেশী। এখানে সাদা চামড়ার লোক বেশী নেই।

শুরু হল পেট্রিকের অনুসন্ধান।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন তিনি—গত ছ বছরের মধ্যে যদি কারো শিশুকন্যা নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে তবে সে যেন এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে।

বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হল স্থানীয় কাগজে। তারপর থেকে রোজই চিঠির তোড়া আসতে থাকে। দু' চারজন দেখাও করে গেলেন। কিন্তু লুসির বাবা-মায়ের কোন সন্ধান মিলল না।

থাকতে থাকতে স্বভাবটা তার অনেকখানি বদলে যায়। আগের মত সে আর যখন তখন দুষ্টুমি করে না। কাঁচা মাংসের প্রতি লোভ অনেকটা কমে গেছে। একদিন তাকে নিয়ে পেট্রিক সাহেব বেড়াতে বেরোলেন। অবশ্য এর একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল। যতদিন

লুসিকে তার সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিতে না পারেন ততদিন তাকে নিয়ে গবেষণা করবেন—এই ছিল তাঁর ইচ্ছে।

জীপ ছুটে চলেছে অরণ্য পথে। অবশেষে এল সেই জায়গাটি যেখান থেকে মুরু লুসিকে ধরেছিল।

পরিচিত পরিবেশ দেখে লুসি আবার তার বন্য জীবনে ফিরতে চাইছে। কিছুতেই সে পেট্রিকের কাছে থাকবে না।

জীপ থেকে মাঝে মাঝে লাফিয়ে পড়ছে। হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে অনেকটা পথ। তারপর নিরাশ হয়ে জীপে ফিরে আসছে।

কদিন বাদে ঘটলো সেই আশ্চর্য ঘটনাটা। বিজ্ঞানী হয়ে যার কোন জবাব এখনো তিনি পাননি।

সেদিন সারারাত ধরে জীপ চালালেন। লুসি শান্ত হয়ে পেছনের সীটে বসেছে। পেট্রিকের হাতে ষ্টিয়ারিং। তিনি ক্রমশঃ গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছেন।

হঠাৎ কানের কাছে নেকড়ের গর্জন শুনতে পেলেন। দেখলেন পূর্ণ বয়স্ক এক নেকড়ে জীপের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে বিশেষ ধরনের শব্দ করছে।

কি ব্যাপার? তবে কি মানব শিশুর সন্ধানে লোভী নেকড়ে ছুটে এসেছে?

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন তিনি। পিস্তলটা রাখলেন হাতে।

চোখের সামনে যা ঘটলো তাতে পিস্তলের কোন ভূমিকা নেই। এ হল দীর্ঘদিন না দেখার পর মা আর মেয়ের অপূর্ব মিলন। পেট্রিক দেখলেন লুসি নেকড়ে মায়ের মুখে মুখ ঘষছে। নেকড়ে মাও তাকে সাধ্যমত আদর করছে।

তার মনে হল লুসি এখন মানুষের মেয়ে নয়, সে হল অরণ্য কন্যা।

আদরের পালা শেষ হতে লুসি একবার ফিরে তাকাল পেট্রিকের

দিকে। তারপর নেকড়ে মায়ের পিছু পিছু অদৃশ্য হয়ে গেল দূরের জঙ্গলে।

শহরে ফিরে এলেন পেট্রিক। কাগজে আবার একটা বিজ্ঞাপন দিলেন—সেই হারানো মেয়েটির বাবা-মায়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। দয়া করে এ বিষয়ে কেউ অনুসন্ধান করবেন না। তাঁর চিন্তা লুসির সত্যিকারের বাপ মা এলে তাদের তিনি কি জবাব দেবেন?

॥ সাত ॥

এবারের পটভূমি স্কটল্যাণ্ড।

ষ্টবেরী, রোডবেরী, ম্যাপল, ওক, ফার, বীচ আর এল্‌মের বিস্তৃত জঙ্গল ঢেকে রেখেছে গোটা হাই ল্যাণ্ডসকে। সেই মনোরম জঙ্গলে শিকারের সন্ধানে এসেছেন লণ্ডনের তরুণ শিকারী উইলবার। এই বয়েসে যথেষ্ট নাম কিনেছেন তিনি। বাঘ মেরে পুরস্কারও পেয়েছেন।

জাতে শিকারী হলে কি হবে, মনের দিক দিয়ে উইলবার হলেন ভাবুক প্রকৃতির। স্কটল্যাণ্ড তাঁর জন্মভূমি, তাই বুঝি তিনি বার বার এই অরণ্যে শিকার করতে আসেন।

এপ্রিলের সকালে বসন্তের রৌদ্রে নাচন লেগেছে পাতায় পাতায়। ছুটন্ত খরগোসের শোভা দেখতে দেখতে উইলবার চলেছেন ঘোড়ার পিঠে। পথটা ক্রমশঃ পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে শিখরে। আশে পাশে অসংখ্য বুনো ঝোপ। যেখানে হিংস্র নেকড়ে আর পাহাড়ী কুকুরের আস্তানা।

স্কটল্যাণ্ডের কুকুররা শক্তিতে বুঝি নেকড়েকেও ছাড়িয়ে যাবে। যেমন চেহারা, তেমন স্বভাব।

উইলবার চলেছেন একমনে। কোন দিকে নজর নেই তাঁর।

হাতে রয়েছে আধুনিক রাইফেল। পিঠের ব্যাগে আছে অসংখ্য কার্তুজ। রাইফেল সঙ্গে থাকতে পৃথিবীর কোন শক্তিকে তিনি ভয় করেন না।

আচমকা নীচের দিকে তাকালেন। বুকটা হিম হয়ে গেল। পাহাড়ের রুক্ষ উপত্যকা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কালো মৃত্যুদুত—ব্ল্যাক হাউণ্ডস অফ স্কটল্যাণ্ড।

ভীষণ ভয়ে ঘোড়াটা চিঁ চিঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে। শক্ত হাতের কবজিতে লাগামটা টেনে ধরেন উইলবার—বন্দুকের নিশানা স্থির করেন।

ঠিক তখন পেছন থেকে সমস্বরে গর্জে ওঠে বুনো নেকড়ের পাল।

সামনে ক্ষুধার্ত পাহাড়ী কুকুরের দল, পেছনে বুনো নেকড়ে। মাঝখানে ঘোড়ার পিঠে উইলবার।

তিনি বুঝতে পারছেন বিপদ ছুদিকে। যে কোন মুহূর্তে ওরা ছুটে এসে তাঁকে টুকরো টুকরো করে দেবে। ভরসা একটা, যেভাবে ওরা দাঁড়িয়ে আছে তাতে মনে হয় উইলবারের দিকে ওদের নজর নেই। ওরা ব্যস্ত আছে নিজেদের কোন পুরোনো ঝগড়া মেটাতে।

আপাততঃ তিনি নিরাপদ। স্কটল্যাণ্ডের অরণ্যে হাউণ্ডদের সঙ্গে নেকড়ের লড়াই দেখবার মত জিনিষ।

সাবধানে তিনি ঘোড়াটাকে পিছোতে লাগলেন। যাতে ওরা তাঁকে দেখতে না পায়। তারপর পৌঁছে গেলেন ছুতিনটি মাথা উঁচু গাছের আড়ালে।

শুরু হল মরণ সংগ্রাম। একটা কালো দৈত্যাকৃতি কুকুর প্রচণ্ডভাবে ছুটে এসে নেকড়ের পালে এসে লাফিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নেকড়েরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালালো।

সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে উইলবার এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের ছবি তুলতে পারতেন। আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে কুকুর আর নেকড়ের ভয়াল গর্জনে।

হঠাৎ তিনি দেখতে পান যে নেকড়ে দলের সঙ্গে রয়েছে একটা ছেলে। সেও ওদের মতো লাফালাফি করার চেষ্টা করছে। চার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে পেছনে এগোচ্ছে।

এখন তিনি কি করবেন? একটু দেরী করলে হিংস্র কুকুরের আক্রমণে ছেলেটি প্রাণ দেবে। যদি গুলী চালান তাহলে কি রক্ষা আছে? গুলীর শব্দ শুনে এরা একসঙ্গে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বেপরোয়া উইলবার বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন। হঠাৎ বুলেটের শব্দ শুনে যুদ্ধরত তুটি দল থমকে গেল। তখনোও তাদের অনেকে উন্মাদের মত কামড়াকামড়ি করে চলেছে।

উইলবার থামলেন না। চেম্বারে যতক্ষণ একটি বুলেট অবশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তিনি গুলী চালিয়ে গেলেন।

অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণের পর রণে ভঙ্গ দিয়ে হিংস্র পশুর দল পালাতে শুরু করে।

ছেলেটিও তাদের সঙ্গে চলেছে। উইলবার তা হতে দিলেন না। তিনি জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ছেলেটিকে ধরে ফেললেন।

দেখলেন, নেকড়ের পালের মধ্যে থেকে একটি নেকড়ে পেছন ফিরে বার বার ডাকছে। সে হয়তো এই শিশুটিকে মানুষ করেছে।

আঁচড়ে কামড়ে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুললো ছেলেটি। রেগে গিয়ে উইলবার বন্দুকের নল দিয়ে ছেলেটিকে আঘাত করেন।

তাকে আনা হল লণ্ডনের হাসপাতালে। সেখানে সে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা বেঁচেছিল। উইলবারের আঘাতে মাথার মধ্যে রক্তক্ষরণ শুরু হয় তার। তাতেই সে মারা যায়।

পরে এই ঘটনার জন্যে উইলবার অনুশোচনা করেন। ইংল্যাণ্ডে নেকড়ে বালকের কাহিনী আর শোনা যায় নি। তাই ওদেশের বিজ্ঞানীরা আপশোস করেন এই ভেবে যে স্কটল্যাণ্ডের নেকড়ে শিশুকে তাঁরা বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি।

॥ আট ॥

এবার শোনা যাক এক নেকড়ে বালকের গল্প, সে আর কয়েক মাসের মধ্যে রূপোলী পর্দার নায়ক হয়ে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পরিচিত হবে।

নাম তার জাম্বো। তাকে পাওয়া গেছে মধ্য-আফ্রিকার সাহারা অঞ্চল থেকে।

সাত বছরের নেকড়ে শিশু জাম্বোকে আবিস্কার করেন পরিচালক নোয়েল মার্শাল। অনেকদিন ধরে নোয়েলের ইচ্ছে ছিল পশু-পাখীদের নিয়ে একটা চলচ্চিত্র তৈরী করবেন। তাই তিনি দিনের পর দিন ধরে অর্থ সংগ্রহ করেছেল।

তারপর শুরু হয়েছে অভিনেতাদের অনুসন্ধানের কাজ। এ কাজ খুব সহজ নয়, যে ছবিতে অভিনয় করবে হিংস্র নরখাদকের দল, তাদের ট্রেনিং দেবার ব্যাপারে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

মার্শাল নোয়েলের ছবিটির নাম "রোর" অর্থাৎ গর্জন।

এই ছবিতে অভিনয় করেছে একশোর বেশী জঙ্গলী সিংহ, জাগুয়ার, চিতাবাঘ ও বুনো ষাঁড়।

তাদের সঙ্গে ছিল জাম্বো নামের নেকড়ে শিশুটি।

জাম্বোর অনুসন্ধানে নোয়েল পুরো একটি বছর দুর্গম আফ্রিকার পথে প্রান্তরে অতিবাহিত করেন।

অধিকাংশ পথ তিনি পায়ে হেঁটেছেন। অনেক সময় পকেটে পয়সা না থাকায় বাস ভাড়া দিতে পারেন নি।

যখন সাহারা মরুভূমি অঞ্চলে পৌছলেন তখন সেখানে উত্তপ্ত গরম। একে সাহারা, তায় গরমকাল। অবস্থাটা সহজেই বোঝা যায়।

সাহারা মরুভূমির উত্তরে আছে বিস্তৃত অরণ্য। সেখানে জন্মায় ছোট ছোট গুল্ম লতা আর কাঁটা ঝোপ।

উত্তর পশ্চিমে আহাগড় থেকে দক্ষিণ পূর্বে টিবেসষ্টি মালভূমি পর্যন্ত হল এই বনাঞ্চলের সীমানা। এখানে আছে রুক্ষ পাথুরে উপত্যকা, মরুভূমির কঙ্কাল আর বালির সমুদ্রের মধ্যে প্রবাহিত ক্ষীণ জলরেখা। যেখানে বছরে দশ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় না। চারিদিকে তাকালে দেখা যায় না এতটুকু সবুজের চিহ্ন।

সেই দুর্গম অরণ্য পথে মার্শাল চলেছেন একা। কুয়ারা পার হয়ে সাঁওয়াকে পেছনে রেখে এগিয়ে চলেছেন আরো গভীর অরণ্যে।

মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে দুটি একটি মরুদ্যান। শীতল ছায়াঘেরা স্বর্গ যেন।

একদিন রাতে ক্লান্ত নোয়েল মরুদ্যানের পাশে বিশ্রাম করছেন। মরুভূমির দেশ তার সমস্ত উত্তাপ হারিয়ে এখন সে একটু শীতল হয়েছে।

আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ, তার মৃদু জ্যোৎস্নায় নোয়েল দেখলেন সামনে এগিয়ে আসছে মানুষের ছায়া।

অবাক হলেন তিনি। এই নির্জন প্রান্তরে মানুষ এল কোথা থেকে?

অভ্যাসবশতঃ হাতটা চলে গেল রাইফেলে। সতর্ক হয়ে বসে রইলেন নোয়েল।

একটুবাদে দেখা গেল যে আসছে সে নেহাতই এক শিশু। বালির ওপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে সে।

এই নির্জন মরুপ্রান্তরে একটি শিশুকে দেখে নোয়েল প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেলেন।

ছেলেটি যেই তাঁকে দেখতে পেল অমনি পেছন ঘুরে ছুটতে শুরু করে।

এমন একটা বিরলতম দ্রষ্টব্যকে চোখের বাইরে যেতে দিলেন না

সুচতুর নোয়েল মার্শাল। ট্রিগার টিপে একবার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতেই ছেলেটা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বালিশের ওপর পড়ে গেল।

নোয়েল তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গেলেন। দেখলেন ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তাকে কাঁধে তুলে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হাঁটতে নিকটবর্তী শহরে এলেন তিনি। তখন বেশ বেলা হয়েছে।

অতটা হাঁটার ফলে নোয়েলের পায়ে বড় বড় ফোসকা পড়েছে।

তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁর। তিনি হাসপাতালের ডাক্তারকে বলেন—দেখুন তো স্যার, এই অদ্ভুত শিশুটাকে।

বাচ্চাটাকে দেখেই ডাক্তার প্রচণ্ড চমকে গেলেন। একি, মানুষের বাচ্চা? নাক মুখ চোখ দেখে তাই মনে হয়। অথচ সারা দেহে বড় বড় জংলী লোম। মাথা ভর্তি শুকনো চুল, হাতে পায়ে বিরাট বিরাট নখ।

সে যাই হোক, তাঁর প্রথম কাজ হল ছেলেটার জ্ঞান ফেরানো। কিছুক্ষণ ক্লোরোফর্ম দেওয়ার পর ছেলেটা চোখ মেলে তাকাল।

চোখের সামনে এতগুলো মানুষ দেখে হয়তো সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাই মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে কেঁদে ফেললো।

যেমন বিদঘুটে শিশু, তেমন অদ্ভুত তার কান্না।

হাত পা ছুড়ে কাঁদছে অথচ চোখে একফোঁটা জল নেই।

যারা ভুত প্রেতে বিশ্বাস করে তারা ভাবলো এ বোধহয় কোন দানোতে পাওয়া শিশু। লোকের কানে কানে খবরটা যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অনেকদূর পৌঁছে গেল।

ডাক্তার মত দিলেন, ও হলো কোন বুনো জন্তু দ্বারা প্রতিপালিত মানবশিশু। কেননা তার হাবভাবে বন্য পশুর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এই অঞ্চলে অনেক হিংস্র পশুর বাস। তাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় এমন লোভনীয় খাবারে দাঁত না বসিয়ে দীর্ঘদিন স্থির থাকতে পারবে না।

কচিদেহের কাঁচা মাংসে জীবজন্তুর দারুন লোভ।

তবে? ছেলেটা এল কোথা থেকে?

হাতে পায়ের গড়ন, চোখের চাউনি ও খাবার ভঙ্গিমা দেখে ছেলেটিকে নেকড়ে শিশু বলে সনাক্ত করা হল।

তা শুনে নোয়েলের আনন্দ আর ধরে না। তার কাহিনীতে প্রধান ভূমিকা ছিল একটি নেকড়ে শিশুর। যে পুরো শৈশব কাটিয়েছে জঙ্গলে। তারপর হঠাৎ একদিন যে আবিস্কার করলো তার আসল বাবা-মাকে।

এই অবস্থায় এক বালকের মনের দ্বন্দ্ব কি রকম হতে পারে, তা নিয়ে কাহিনীটি রচিত।

নোয়েল সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির নাম রাখলেন জাম্বো। তারপর পরের দিন সকালের প্লেনে তাকে নিয়ে পাড়ি দিলেন আমেরিকার দিকে।

একটি মাত্র নেকড়ে শিশুর অভাবে নোয়েলের এতবড় কাজ পঙ্গু হতে বসেছিল। এখন তাঁর মনে বাড়তি আশা। জীবনে তিনি সফল হবেন।

জাম্বোর আসল পরিচয় বিশেষ কিছু জানা গেল না। তবে অন্য নেকড়ে বালকের তুলনায় সে অনেক সভ্য। অন্যেরা যখন আঁচড়ে কামড়ে একাকার করছে, জাম্বো তখন মার্শালের আদেশে পড়াশোনা শিখেছে।

তা দেখে বিশিষ্ট শিক্ষকরা মন্তব্য করেন—জাম্বো মাত্র কয়েকটা বছর জঙ্গলে কাটিয়েছে। তাই সে সভ্যতা ভদ্রতা ভুলতে পারেনি।

কয়েকমাসের মধ্যে মোটামুটি কথা বলতে শিখলো জাম্বো। ছ'মাসের মাথায় কালো শ্লেটের ওপর সাদা চক পেন্সিলে লিখলো ভগবান অর্থাৎ গড শব্দটি।

তারপর নোয়েলের নির্দেশনায় শুরু হল তার অভিনয় শিক্ষা।

এক নেকড়ে বালকের ভূমিকাতে নিখুঁত অভিনয় করছে জাম্বো।

অবশ্য সে এখনো ভাল করে কথা বলতে শেখেনি। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কিছুই শেখেনি। এখনোও সে কাঁচা মাংস খেতে ভালবাসে।

রোর ছবিটির শুটিং চলছে বোষ্টনের কাছাকাছি একটি শহরে।

জাম্বোকে দেখার জন্যে অসংখ্য মানুষের ভিড় হয়। সে সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। ফটোগ্রাফাররা ক্যামেরা নিয়ে এলে ছবি তোলার বায়না তোলে।

তাই বুঝি গর্ব করে নোয়েল বলেছেন—আমি সব সময় জাম্বোকে আমার ছেলের মত দেখি। তার সঙ্গে দেখা না হলে এই ছবিটা আমি শেষ করতে পারতাম না।

রোর ছবিতে অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা আছে। যা আমাদের নির্বাক করে দেয়। যেমন একবার দুই সিংহের লড়াই থামাতে গিয়ে নোয়েল হলেন জখম। তিনি বুনো সিংহদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে সেই ছবিটা তোলার চেষ্টা করেন।

শুধু সিংহ নয়, বুনো বাইসনের গোঁ বড় সাজ্ঘাতিক। কোন কারণে ক্ষেপে গেলে তারা মাথা নীচু করে ছুটে আসে।

এর ওপর আছে প্রকৃতির অভিশাপ।

এইতো সেদিন দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়াতে সুটিং সেরে এলেন তিনি।

সুটিংয়ের সময় সেখানে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল। বন্যার বিধ্বংসী জলের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন মার্শাল নোয়েল। সঙ্গে গেছে তাঁর আদরের জাম্বো।

ভাগ্যিস জাম্বো মাঝরাতে শহরের পথে একা ভ্রমণ করেনি। তাহলে তার অবস্থা হত ঐসব দুর্লভ আফ্রিকান সিংহের মত। যাদের মেরে দিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। পরে নোয়েল অবশ্য ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। কিন্তু সে টাকা তিনি পাননি; কেননা জীবজন্তু ইনসিওর করা ছিল না। এর পর কিছুদিন নিশ্চুপ থাকার পর আবার জ্বলে উঠলেন মার্শাল নোয়েল।

এবার তিনি সমস্ত পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান। জাম্বোর ওপর তাঁর অনেক আস্থা। তিনি বিশ্বাস করেন যে একদিন না একদিন জাম্বো তার আগের জীবনে ফিরে যাবে। তখন সে হবে সিনেমা পরিচালকদের মস্ত বড় সম্পত্তি।

রোর এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু সব টাকা খরচ করে ফেলেছেন নোয়েল। তাই সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহরের বুকে অবস্থিত একশো কুড়ি একর জমি বিক্রী করে টাকা যোগাড় করছেন মার্শাল নোয়েল।

যখন তিনি গালে হাত দিয়ে আনমনে ভাবতে বসেন তখন শান্ত ছেলের মত জাম্বো পাশে বসে। এখন সে দিব্যি দুপায়ে হাঁটে। রান্না করা খাবার খায় আর রাতে আরামে ঘুমোয় শোফাতে।

অবশ্য নোয়েলের বউ টিপ্পি জাম্বোকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। সকাল সন্ধ্যে তাকে দেখলেই দুর দুর করে সে।

বউয়ের কথা শুনে ভারী দুঃখ হয় নোয়েলের। তিনি জানেন বন্য জন্তুর তুলনায় মানুষ কত নিষ্ঠুর। মা পছন্দ না করুক মেয়ে মেলানির তাতে বয়েই গেল। জাম্বো যেন তার ছোট ভাই। সারাদিন মেলানি জাম্বোর সঙ্গে কাটায়। তার ঠোঁটে হাত রেখে তাকে কথা বলা শেখায়। আর দোকান থেকে নিত্য নতুন উপহার কিনে আনে।

সাত বছরের জাম্বো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রঙচঙে বইয়ের দিকে। ঝুমঝুমি বাজাতে বাজাতে ভাবে কোন মার কথা?

আসল মা নাকি নেকড়ে মা? সে তো এখনো মনের ভাব বলতে শেখেনি।

নোয়েলের মনে ভারী কষ্ট। জাম্বো কোন কথা বলতে পারছে না। তাহলে সিনেমায় সে কথা বলবে কি করে? তবে কি অন্য কারোর সাহায্য নিতে হবে? যে আড়ালে থেকে জাম্বোর গলা নকল করবে।

এ ব্যাপারটা মোটেই মনঃপুত হয় নি তাঁর। তিনি চাইছেন বাস্তব ছবি করতে। তার মধ্যে যেন এতটুকু ফাঁকি না থাকে।

দরকার হলে জাম্বো কোন কথাই বলবে না।

ইতিমধ্যে হাজির হলেন কেনিয়ার বিখ্যাত অভিনেতা কারালো মটয়ো। জীবনের অনেকগুলো বছর তিনি বন্য পশুপাখীর মধ্যে কাটিয়েছেন। রেগে গেলে চিতাবাঘ কেন গর্জন করে, শীতের শেষে বালি হাঁসের দল কোথায় উড়ে যায়, অথবা খিদে পেলে বাঘের শাবক কতখানি হিংস্র হয়—এসব গোপন খবর তিনি জানেন।

জাম্বোকে দেখে ভারী খুশী হলেন কারালো মটয়ো। রোর ছবিতে যিনি হয়েছেন জাম্বোর পালক পিতা। তিনিই যেন বন্দুক কাঁধে নিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে জাম্বোকে আবিষ্কার করবেন।

প্রথম থেকেই দুজনের মধ্যে ভারী ভাব। মেলানি বৃথাই চোখের জল ফেলে। এতদিনে জাম্বো তার মনের মত বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছে।

কারালো আসার সাতদিনের মধ্যে ঘটলো সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা!

সারাদিনের শুটিংয়ের শেষে নোয়েলরা সবাই রাতের ডিনার খেতে ব্যস্ত। মনের সুখে জাম্বো মাংসের হাড় চুষছে। হঠাৎ কারালো যেন ঠাট্টা করে প্রশ্ন করেন—জাম্বো, তোমার নাম কি?

রোজ রাতে শুতে যাবার আগে কারালো জাম্বোর আসল নাম জানতে চান।

জাম্বো জবাব দিতে পারে না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সেদিন সবাইকে অবাক করে। ও স্পষ্ট বলল—মাই নেম ইজ পল।

জাম্বোর মুখে পল নামটা শুনে নোয়েল থালা ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর উত্তেজিত ভাবে জাম্বোর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন—পল, পল, তোমার বাবার নাম কি?

ফাঁকা ঘরে বৃথাই প্রতিফলিত তাঁর প্রশ্ন।

পল আর জবাব দিতে পারলো না।

নিরাশ হলেন নোয়েল। তবু আশা ছাড়লেন না।

তিনমাস শুটিং শেষ করে কেনিয়ার অভিনেতা কারালো মটয়ো নিজের দেশে ফিরে গেছেন। যাবার আগে পলকে জানিয়ে গেছেন শেষ শুভেচ্ছা। সেদিন আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় পলের চোখে জল নেমেছিল।

ওঁরা সবাই অবাক হয়ে দেখছিলেন যে মানুষের শিশুর মত পল কাঁদছে।

আজও প্রতি রাতে শুতে যাবার আগে উৎসাহী পরিচালক নোয়েল মার্শাল পলের কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন করেন—পল, পল, তোমার বাবার নাম কি ?

বোকার মত পল একই কথা বলে—মাই নেম ইজ পল! মাই নেম ইজ পল!

নোয়েল জানেন, একদিন না একদিন পল তার বাবার নাম বলবে। সেদিন জানা যাবে পলের গোপন ইতিহাস।

একথা ভাবলেই নোয়েলের সারা দেহে অদ্ভুত এক শিহরণের স্রোত বয়ে যায়। নেকড়ে শিশু মানুষের গলায় তার পরিচয় জানাবে —সেটা যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তাঁর, পলের আসল বাবা এসে যদি পলকে দাবী করে, তাহলে ?

সাহারার রুক্ষ মরু প্রান্তরে যে অসহায় নেকড়ে শিশুকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, দীর্ঘ দিন ধরে যার সেবা করেছেন, যে হয়েছে তাঁর স্বপ্নের চলচ্চিত্রের সফল নায়ক—তাকে কি তিনি বিদায় দিতে পারবেন ?

প্রশ্নটা বারে বারেই তোলপাড় করে নোয়েল মার্শালের মন। অথচ তিনি এর জবাব খুঁজে পান না।

॥ নয় ॥

এতক্ষণ যেসব নেকড়ে শিশুর কথা বলা হল তাদের নেকড়ে মায়েরা ছিল হয় কালো অথবা ধূসর রঙের

এবার যে নেকড়ে শিশুর কথা বলবো তার নেকড়ে মা হল বরফের মত সাদা।

সাদা নেকড়ের সংখ্যা খুব কম, পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি দেশে তাদের দেখা মেলে।

কোথায় থাকে তারা? অন্ধকারের মহাদেশ আফ্রিকায়? নাকি চির অজানা অষ্ট্রেলিয়ায়? অথবা আমাজনের গহন অরণ্যে?

না, থাকে না তারা আফ্রিকায়—অষ্ট্রেলিয়ার আমাজনে।

তাদের ঠিকানা লেখা আছে উত্তর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে। যে দেশটা বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ দিন সূর্যের মুখ দেখে না। ভর দুপুরে যেখানে ঘুম পাড়ানি ছায়ার লুকোচুরি, সেই বিচিত্র সুন্দর শ্বেত তুষারের নির্জন প্রান্তরে আছে সাদা নেকড়ের দল।

সে এক ভারী মজার দেশ। যেখানে মাসের পর মাস ধরে চলে দিন, আকাশে সূর্য নেভে না। আবার শুরু হয় সূর্য ক্ষীণ শীতল রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। নিস্তব্ধ, নিষ্প্রাণ, ভয়ঙ্কর।

সারাদেশ ঘষা কাঁচের মত জমাট বরফে ঢেকে যায়।

তার মাঝে প্রচণ্ড হিম ঝঞ্ঝা ক্ষ্যাপা জন্তুর মত গর্জন করে বয়ে চলে। অন্ধকার হিমেল বরফের কারায় বন্দিনী ধরিত্রী মাতা যেন গুমরে কেঁদে ওঠে।

বুঝি সে এক মুঠো রোদ্দুরের জন্যে প্রার্থনা করে। কিন্তু নিষ্ঠুর সূর্য তার কোন কথাই শোনে না।

সেই ছায়া ঘন অন্ধকারে মাঝে মাঝে কানে আসে ক্ষুধার্ত

নেকড়েদের রক্ত জল করা একটানা সুরেলা গর্জন। আর সেই ঝড়, তুষার পাত, নেকড়েদের গর্জন ও অসীম অন্ধকারের মাঝে নিস্তব্ধ পদসঞ্চারে ঘুরে বেড়ায় বরফ রাজ্যের নির্মম ভয়ঙ্কর পশুরাজ।

না, সিংহ নয়। হিংস্র শ্বেত ভল্লুক। মৃত্যু যে দেশের পায়ে ঘোরে। যেন বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় তার হাহাকার।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্বউত্তরে আছে কানাডা নামের এক সুবিশাল দেশ। সে দেশ দুর্গম—দুরধিগম্য। দুর্গম বলেই কানাডা দুরন্ত অভিযাত্রীকে বার বার ডেকেছে হাতছানি দিয়ে।

উত্তর মেরু আবিষ্কারের নেশায় মানুষ ছুটে চলেছে তুষার ও বরফ ভরা মহাপ্রান্তরের ওপর দিয়ে। পাড়ি দিয়েছে সে হিম শীতল ঠাণ্ডা সমুদ্র। ভয়ঙ্কর হিম ঝঞ্ঝা এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। তবু সে বাধা মানে নি।

উত্তর মেরুকে কেন্দ্র করে আছে এক কল্পিত রেখা। যাকে বলে মেরু বৃত্ত। সাইবেরিয়া, উত্তর ইউরোপ, আলাস্কা, কানাডা ও গ্রীন-ল্যাণ্ডের বেশ কিছু অঞ্চল এর মধ্যে অবস্থিত।

গত বছর মে মাসে মেরু বৃত্ত অঞ্চলে ব্যাপক এক অভিযান চালানো হল। পারমানবিক শক্তি চালিত জাহাজ পাড়ি দিল সেই চির তুষারের দিকে। খুঁজে আনলো নানা দুঃপ্রাপ্য ধাতুর ঠিকানা।

সেকথা থাক, আমরা শুনবো সাদা নেকড়ের মাতৃ স্নেহের বিচিত্র কাহিনী। গল্পটি বলেছেন বার্নার্ড হাইমার নামের এক কানাডিয়ান শিকারী। তিনি চ্যাঞ্জেলার জাহাজে চড়ে ঘুরে এলেন সেই বরফের দেশ থেকে।

তাঁর ডাইরী থেকে গল্পটা বলা হল :

এখন মে মাস।

সবে মাত্র বরফ গলতে শুরু হয়েছে। আমাদের জাহাজ চলেছে তুন্দ্রা মরুভূমির কাছে।

শীতে এই অঞ্চল জমাট বরফে ঢাকা থাকে। বসন্তে এবং গ্রীষ্মে হঠাৎ চোখ মেলে তাকায় একরকমের শ্যাওলা, যার নাম মস।

আর জন্মায় নানা জাতের ঘাস ও ছোট ছোট ফুলের গাছ। এছাড়া চোখে পড়ে দু-চারটে বেটে খাটো উইলো গাছ। রেড ইণ্ডিয়ানরা তাচ্ছিল্য করে যার নাম দিয়েছে সরু কাঠির গাছ।

চোখে পড়ছে ভাসমান হিমবাহ। জাহাজের ক্যাপ্টেন সাবধানে জাহাজ চালাচ্ছেন। দিন যত যায় সমুদ্র ততই ভীষণ হয়ে উঠেছে। যেদিকে তাকাই শুধু বরফ আর বরফ। বাতাস আর স্রোতের বেগে তারা সব সময় ঘুরছে। আর পরস্পরের ধাক্কা লেগে বিকট শব্দ করে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

মনে হয় এ যেন খামখেয়ালী প্রকৃতির বিচিত্র খেলা।

বরফ রাজ্যের গোলক ধাঁধাঁর ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা, দিনের দৈর্ঘ্য বাড়ছে, ছোট হয়ে আসছে রাত্রি।

মনট্রিল শহর ছেড়েছি সতের দিন আগে। মনে হয় যেন কবেকার কথা।

চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। দূরবীন দিয়ে দেখলুম বহু দূরে ছোট বড় অনেক দ্বীপ উপদ্বীপ মুক্তোমালার মত পড়ে আছে।

অবশেষে জাহাজ এসে থামল কূলে। খানিক পরে তীরে পা দিতেই মনটা আমার অদ্ভুত আনন্দে গেল ভরে।

বুঝলুম এই পৃথিবী আমাদের কত প্রিয়। তাকে না দেখলে মন কেমন করে।

মাথার ওপর নানা রঙের পাখির মেলা। যেদিকে তাকাই শুধু পাখি আর পাখি। ফুটেছে রঙবেরঙের ফুল। লম্বা ঘাস ঢেকে দিয়েছে সর্বত্র।

বুঝি সুদীর্ঘ শীত রাত্রির মৃত্যু শীতল নিস্তব্ধতার ধ্যানমগ্ন তপস্যার পরে বসন্তের প্রকৃতি জেগে উঠেছে তার রূপ রস বর্ণ গন্ধ ও শব্দের অফুরন্ত ঐশ্চর্য্য নিয়ে।

আমি শিকারী; বন্দুক কাঁধে নিয়ে জলে জঙ্গলে শিকার করাই আমার কাজ। তাই প্রকৃতিকে বিদায় জানিয়ে কুকুর টানা স্লেজ গাড়ির সওয়ার হয়ে চললুম গ্রীষ্মের বরফগলা জলের নদী পার হয়ে।

পাশেই অপরূপ রঙের সমুদ্র। বাতাসের সঙ্গে আনন্দে হিল্লোলে খেলা করছে।

শুরু হল বনাঞ্চল। অগুনতি পাখীর কলরবে বাতাস ভরে গেছে। এরা সবাই পর্যটক পাখী। বসন্তের আভাস জাগতেই সমুদ্র পর্বতের বাধা পার হয়ে ছুটে আসে।

কত রকমের যে পাখী, তার আর শেষ নেই। তুষার পেঁচা, শঙ্খচিল, রাজহাঁস, লার্ক, টার্ন। আরো কত নাম।

তুন্দ্রা অঞ্চলের অরণ্য ভারি অদ্ভুত। একটানা গাছেরা দাঁড়িয়ে নেই। এখানে ওখানে গুচ্ছ গুচ্ছ উদ্ভিদের সমাবেশ।

আমরা যেখানে এসেছি ডাঙ্গাটা সেখানে ধনুকের পিঠের মত দক্ষিণে বেঁকে বহুদূর পশ্চিমে গিয়ে শেষ হয়েছে। তারপরই বিরাট বাঁক। সেই বাঁকের মুখে চামড়ার তৈরী উমিয়াক নৌকো দেখা যাচ্ছে।

অরণ্য পথে ছুটে চলেছে স্লেজ। চারটি কুকুর মাথা নীচু করে ছুটছে। দূরবীন চোখে লাগাই। দেখি অনেকদূরে এক সুমেরু শেয়াল খরগোস শিকার করছে।

চোখের নিমেষে শিক্ষিত কুকুর গাড়ীটা সেখানে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমার রাইফেল গর্জন করে ওঠে।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল শেয়ালটা। প্রকৃতির শান্তিনিকেতনে শুরু হল তোলপাড়। রাইফেলের অস্বাভাবিক বিকট শব্দে নিস্তব্ধ জীবন যাত্রার ভারসাম্য যেন হারিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

পাহাড়ে পাহাড়ে বেজে উঠল ভীত সন্ত্রস্ত জন্তু-জানোয়ারের কণ্ঠস্বর। তার মধ্যে আমি যেন এক মানব শিশুর কান্না শুনতে পেলাম!

আমার সঙ্গী হ্যারী শিয়ালটাকে নিয়ে এল। মাথায় গুলী লেগেছে।

হ্যারী যেই শিয়ালটাকে তুলতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে উইলো ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক শ্বেত নেকড়ে। দেখে আমার রক্ত জল হয়ে যায়। সুমেরুর শ্বেত নেকড়ে সাংঘাতিক। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায় ওরা। বাতাসে গন্ধ শুঁকে ছুটে আসে।

দেখলুম, টকটকে লাল জিভে লালা পড়ছে। তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর দাঁত দুপাটি ঝকঝক করে উঠলো, হ্যারীর দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি।

নিঃশব্দে ছুটে আসছে সে। আর কয়েক হাতের ব্যবধান। সমস্ত রক্ত বুঝি বুকে এসে জমা হয়েছে। রাইফেল তুলে নিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে গাছের নীচে একটি মানব শিশুর মুখ। স্বপ্ন না সত্যি? বরফের রাজ্যে মানুষের শিশু এল কি করে? তবে কি কোন এস্কিমো মায়ের হারানো সন্তান?

চোখের পলকে সাদা নেকড়ে লাফিয়ে পড়ল মৃত শেয়ালের ওপর। তারপর ছুটে গেল বনের দিকে।

হাতে আমার ৩০·৩০ ক্যালিবারের রাইফেল। এখনও এক গুলিতে নেকড়েটাকে শেষ করে দেওয়া যায়।

বাচ্চাটা যেন কেঁদে উঠলো না? এই বিস্তৃত বরফের নিস্তব্ধ অরণ্যে বলগা হরিণ, সিন্ধুঘোটক আর সাদা ভালুকের মধ্যে বসে আছে এক অসহায় মানব সন্তান?

শ্লেজ ছেড়ে আমি বাচ্চাটার কাছে এগিয়ে গেলাম। ওকে তো এখানে ফেলে যেতে পারি না।

কি ফুটফুটে চেহারা, যদিও দীর্ঘদিন নেকড়ে মায়ের কাছে থাকার ফলে কিছুটা বন্য হয়েছে তার স্বভাব।

খুব কাছে মৃত শীতল গর্জন শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ভর দিয়ে ছুটে এল এক সাদা নেকড়ে। সে বাচ্চাটাকে মুখে করে তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমেরু অরণ্যে এসেছি শিকারের সন্ধানে। আজ নেকড়ে মায়ের দেখা পেয়ে সব কাজ নষ্ট হয়ে গেল।

এখন শুধু এই রহস্য ভেদ করতে হবে।

হ্যারীও কম অবাক হয় নি। আমি ফিরে আসার পর ও বললো—তোমার কি মনে হয় বলতো? সত্যিই কি ওটা মানুষের বাচ্চা নাকি কোন নেকড়ে শিশু?

হ্যারীকে অবাক করে দিয়ে আমি বলি—না হ্যারী, প্রথমে আমারও তাই সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। ওটা মানব শিশু।

স্লেজ ছুটে চলে। দুপাশে পড়ে থাকে তুন্দ্রার উইলো অরণ্য।

সাত সাতটি দিন কেটে গেল নেকড়ে মায়ের সন্ধানে। জুন মাসের প্রথমে আকাশে শুধুই সূর্যের খেলা। দিগন্তের নীচে সে নামছে না। পৃথিবীতে অন্ধকার বলে একটা কথা আছে তা কে বলবে?

পাহাড়ী ঢাল থেকে ভীষণ তোড়ে তুষার গলা জল নামছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে হাজার হাজার শীল, সিন্ধুঘোটক আর তিমি, হাঙ্গর প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর দল।

সাতদিনে একবারও নেকড়ে মায়ের সন্ধান পেলাম না। মনে হয় সবই যেন আমার চোখের ভুল।

তাঁবুর নীচে বসে এইসব সাত পাঁচ ভাবছি। একটু বাদে কানে ভেসে এল দুই ক্রুদ্ধ জানোয়ারের হিংস্র গর্জন। হ্যারীকে সঙ্গে নিয়ে বন্দুক কাঁধে উঠে দাঁড়াই।

দূরবীন চোখে লাগাতে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। অদূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুই জননী—শ্বেত নেকড়ে আর শ্বেত ভাল্লুক।

দুজনের গায়ের রঙ বরফের মত সাদা। আকারে শ্বেত ভালুক অনেক বড়।

কি নিয়ে তাদের এই ঝগড়া?

তাও দেখতে পাওয়া গেল। নেকড়ে মায়ের পেছনে ভয়ে

জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু তিনটি শাবক। তাদের কোলে চুপটি করে বসে আছে আমার সাত রাজার ধন এক মানিক—সেই এস্কিমো শিশুটি।

শ্বেত ভালুকের পায়ের পেছনে বসে আছে সাদা তুলোর বলের মত লোমশ বাচ্চা।

যেভাবে তর্জন গর্জন করে ছুটে আসছে সাদা ভালুক তাতে মনে হয় নেকড়ে মা বোধ হয় তার বাচ্চাদের বাঁচাতে পারবে না।

ভাল্লুককে কেন যে পশুরাজ বলা হয়, আজ বুঝলাম। অতবড় জানোয়ার, কি প্রচণ্ড তার শক্তি।

বিদ্যুৎতের মতো ভালুকের মাতা গিয়ে পড়ল নেকড়ে মার ওপর। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে নেকড়ে মা আর্তনাদ করতে করতে ছিটকে পড়ল দূরে। দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করলো, দাঁত খিচিয়ে উঠলো, পারলো না।

দুরন্ত রাগে গরগর করতে ছুটে গেল ভাল্লুক মা। এক মুহূর্তের মধ্যে সে নখ আর দাঁত দিয়ে ফালা ফালা করে দেবে নেকড়ে মাকে।

একবার ভাবি তাই হোক, তাহলে এস্কিমো শিশুটাকে ধরে ফেলতে পারবো। হয়তো তার আসল মায়ের সন্ধান পেতে পারি।

সেই কারণে বন্দুক নামিয়ে রাখি। কিন্তু হ্যারীর রাইফেল বিষ বর্ষণ করল। ভালুকের বুক লক্ষ্য করে পর পর তিনটি বুলেট ছুঁড়লো সে। অবাক হয়ে ভালুকটা শিকার ছেড়ে তাকালো আমাদের দিকে। পাঁজরে তিনটি বুলেটের আঘাত নিয়েও লাফিয়ে উঠলো শূন্যে। আমার বন্দুক এবার সরব হল। সাদা দেহ থেকে লাল রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসে। বরফের রাজ্যে শুয়ে রইলো সুমেরুর সম্রাজ্ঞী।

আশে পাশে সন্দেহ ভরা চোখে তাকিয়ে মা নেকড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চোখের আড়ালে চলে গেল। এবার কিন্তু আমি তাকে কিছুতেই অদৃশ্য হতে দেব না!

মায়ের মৃত্যুতে বাচ্চা ভাল্লুকটা যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। নাক দিয়ে শুঁকে শুঁকে দেখছে তার মা সত্যি মরে গেছে কি না।

হ্যারী ছুটে গিয়ে বাচ্চাটার মাথায় হাত রাখতেই সে ফ্যাস করে কামড়ে দিল। তারপর ছুটে পালাল দূরের অরণ্যে। ঐটুকু একটা জন্তু, মানুষকে বিশ্বাস করে না।

চার চারটি হাসকি কুকুর ছুটে চললো। নেকড়ে মায়ের সন্ধান চাই-ই।

শুরু হল মানুষে-পশুতে বিচিত্র খেলা।

এই দেখছি ঝোপের আড়ালে রোদ পোহাচ্ছে নেকড়ে মা। তার বুকের দুধ খাচ্ছে মানব শিশু। যেন সে নেকড়ের আপন ছেলে। আবার দেখছি বরফ গলা খাল পার হয়ে লাফ দিচ্ছে সাদা নেকড়ে।

এমনভাবে আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। আমাদের অন্তবিহীন লুকোচুরি যেন শেষ হবে না।

অবশেষে একদিন চ্যাঞ্জেলার জাহাজের ক্যাপ্টেন পাঠালেন তাঁর বার্তা। এবার শিকারে মন দিতে হবে। গত পনেরো দিনে আমি কোন রিপোর্ট পাঠাই নি। আর মাত্র সাত দিন বাদে চ্যাঞ্জেলার কানাডার দিকে ফিরবে। যদি আমরা যোগাযোগ না করি তাহলে বরফের দেশে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে।

মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। বেশ ক'দিন এক অর্থহীন খেলায় মেতে ছিলাম। এবার শুধু কাজ আর কাজ।

সেদিন বিকেলে শেষ বারের মত দেখতে পেলাম নেকড়ে মায়ের ছেলে মানব শিশুকে।

ওদের অনন্ত শান্তির ব্যাঘাত না করে আমি আর হ্যারী নিঃশব্দে স্লেজ গাড়ীতে চড়ে বসি।

গাড়ী ছুটে চলে এস্কিমোদের গ্রামের দিকে।

তিন মাস বাদে কানাডায় ফিরেছি। এখন মনট্রিল শহরের

বিলাসবহুল বাড়ীতে বসে তাকিয়ে থাকি উত্তর মহাসাগরের অনন্ত জলরাশির দিকে।

সহসা মনে হয় সুমেরু রাজ্যের স্বল্পস্থায়ী দৃশ্য এখন বিদায় নিয়েছে। আকাশে বাতাসে বাজছে বিষন্নতার সুর। বিষাদের যবনিকা নেমেছে।

রাতের তুষারপাতে ঝিকমিক করছে পাহাড়ের শিখর। পর্যটক পাখীর দল নিয়েছে বিদায়। ফুলপরীরা চলে গেছে। রঙের বাহার শেষ।

তারই মাঝে নেকড়ে মা বাঁচিয়ে রেখেছে তার আদরের মানব শিশুকে। মৃত্যু শীতল কফিনের সাদা আস্তরণে মুখ ঢেকেছে পৃথিবী। তবুও নিরাশ হয় নি নেকড়ে মা।

আর এস্কিমো গাঁয়ের কোন এক মানবী মা হয়তো এখনো মাঝে মাঝে ভাবে তার হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট ছেলের কথা। চোখের জল ফেলে। ভাবে সেই ছেলে বেঁচে নেই, হারিয়ে গেছে তুষার ঢাকা অরণ্যের অন্ধকারে।

॥ আট ॥

এখনকার কাহিনীর পটভূমি অষ্ট্রেলিয়া।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এক সুবৃহৎ দ্বীপপুঞ্জে এই গল্পের সুরু। যেখানে আছে মৌসুমী বাতাসের নীচে অজানা অরণ্য অঞ্চল। আছে দীর্ঘ ঘাসের জঙ্গল। যেটা গিয়ে মিশেছে তৃণ ঢাকা রুক্ষ প্রান্তরে, সুরু হয়েছে মরুভূমি।

সেই মরু প্রান্তরে মুলগা আর পরজুপাইন গাছের নীচে বুনো নেকড়ের আস্তানা। যেখানে ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি আর শৈত্য বয়ে আনে সবুজ বনানীর সৌরভ।

এই কাহিনী কোন অজ্ঞাত নেকড়ে বালকের নয়। এ হল এক কিশোরী মেয়ের গল্প। যে নেকড়েদের গুহায় কাটিয়ে এসেছে সাতটি দিন। সঙ্গে এনেছে অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা।

নাম তার বারবারা। পড়তো সে সিডনির স্টেট পাবলিক স্কুলে। ছোট বেলা থেকেই ডানপিটে, স্কুলের ছুটি হলে একা একা বেরিয়ে পড়ে শহর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম পার হয়ে অরণ্য অঞ্চলের নিভৃত উপত্যকায়।

সঙ্গী বলতে তার টাট্টু ঘোড়া জ্যাকব। ছুটিতে ভারী ভাব ইচ্ছে হলেই জ্যাকবের পিঠে চড়ে বারবারা চলে যায় ঘন ঘাসে ঢাকা দূর বনানীতে।

এমনভাবে একদিন হঠাৎ সে আর ফিরে এল না। শনিবার স্কুল ছুটির পরে দিন-দুয়েকের জন্য বেড়াতে যাবে বলে বেরিয়েছিল বারবারা। দেশ দেখার নেশা তার মনে। দু'চারদিনের ছুটিতে ঘুরে আসে ক্যানবারা, নিউক্যাসেল, ব্রুকেনহিল থেকে।

সবাই ভেবেছিল সময়মত সে ঠিক ফিরে আসবে।

রবিবার কেটে গেল, চলে গেল সোমবার। তখনও ফিরলো না বারবারা।

এবার ভাবতে বসলেন বাবা-মা। সুরু হল খোঁজ-খবর। আশেপাশের সব কটি থানাতে খবর পৌঁছে গেল। বারবারা নামের এক সোনালী চুলের কিশোরী মেয়ে হারিয়ে গেছে ক্যানবারা যাওয়ার পথে। কোন সন্ধান মিললো না তার।

চিন্তায় চিন্তায় বাবা-মার চোখে ঘুম নেই। বন্ধুদের মুখ ভার। হাসি-খুশী ছিল বলে স্কুলের সবাই তাকে ভালবাসতো। সে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়াতে বুঝি শোকের ছায়া নেমেছে পাবলিক স্কুলে।

এমনভাবে কেটে যায় সাত সাতটি দিন। বাবা ধরে নিয়েছেন যে মেয়েকে তিনি আর খুঁজে পাবেন না। হয়তো বন্য জন্তুর আক্রমণে সে মারা গেছে।

পথ দুর্ঘটনা হলে ট্রাফিক পুলিশ খবর পাঠাত।

মা তখনও বিশ্বাস করছেন বারবারা তাকে ফেলে চলে যেতে পারে না। সে নিশ্চয় ফিরে আসবে।

শনিবার রাতে হঠাৎ একটি টেলিগ্রাম পেলেন ফিডার।

চমকে উঠলেন তিনি। বারবারা বেঁচে আছে। সে টেলিগ্রাম করেছে ক্যানবারা ফরেষ্টের পোষ্ট অফিস থেকে। লিখেছে—বাবা, আমি ভাল আছি, দু'একদিনের মধ্যে তোমাদের কাছে ফিরবো।

দুটি দিন কাটলো উৎকণ্ঠায়। তারপর সত্যি সত্যি ফিরে এল বারবারা।

মেয়ের চেহারা দেখে ভয়ে যেন আঁতকে ওঠেন মা। মাত্র কদিনে একি অবস্থা হয়েছে তার চোখ-মুখের? সুন্দরী বলে তার খ্যাতি ছিল। কিন্তু চোখের কোণে কালচে দাগ, ঠোঁট কেটে গেছে, চিবুকে থাবার আঁচড়।

কি বীভৎস লাগছে তাকে।

মা এসে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। বললেন—বারবারা, কি হয়েছিল?

মায়ের কথা শুনে বারবারার ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে মলিন হাসি। সে বলে—জানো মা, আমি নেকড়ের গুহা থেকে ফিরে এসেছি।

—বলিস কিরে?

মেয়ের কথা শুনে মার মনে পড়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা অরণ্যের চলমান বিভীষিকার কথা। যারা নিঃশ্বাসের চেয়ে দ্রুত ছুটে যায় ক্ষুধার অন্বেষণে। সেই ক্ষুধার্ত বন্য নেকড়ের কবল থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে তার আদরের মেয়ে বারবারা।

এক কাপ কফি খেয়ে সহজভাবে বারবারা বলতে শুরু করে তার শঙ্কা শিহরিত দিনগুলির কথা।

অষ্ট্রেলিয়ার সব কটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল বারবারা

ট্রাঙ্কালারের অদ্ভুত কাহিনী। যে নিজের চোখে দেখেছে নেকড়ে জননীকে। তারপর ফিরে এসেছে পৃথিবীতে।

বারবারার কথা শুনে দেশ-বিদেশের উৎসাহী মানুষের দল চিঠি পাঠাল। প্রাণী বিজ্ঞানিরা তার সঙ্গে দেখা করল।

এতদিন ধরে নেকড়ে জননী সম্পর্কে মানুষের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। যাদের আমরা নেকড়ে বালক বলে অভিহিত করেছি। তাদের জীবন এতই রহস্যময় যে তা থেকে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয় নি।

সবচেয়ে অসুবিধে ছিল যে তারা কেউ কথা বলতে পারত না। আভাসে ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করত মাত্র। তাই সবটুকু জানা যেত না। বিজ্ঞানীরা সন্দেহ ভরা চোখে ভাবতো এসব আজগুবী গল্প কথার দিকে।

রাতারাতি যেন বিখ্যাত হয়ে গেল বারবারা। সাতটি দিনের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে সে একটি চাঞ্চল্যকর বই লিখে ফেলে যা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

বারবারার সে বিখ্যাত বই "সেভেন ডেজ উইথ এ উলফ মাদার" থেকে এখন শোনা যাক তার ভয়ঙ্কর সুন্দর কাহিনী।

শনিবারের বিকেলে স্কুলের ছুটীর পর জ্যাকবের পিঠে চড়ে সিডনি শহরকে অতিক্রম করে চলে এসেছি সবুজ অরণ্য প্রান্তরে। যেখানে ছড়িয়ে আছে গুল্ম লতা, খেঁকশিয়াল, নেকড়ে আর ভালুকের আস্তানা। সেই জঙ্গলটা মিশে গেছে গ্রেট ভিক্টোরিয়া ভ্যালীতে। একপাশে সমুদ্রের কোলাহল অন্যপাশে শহরের আর্তনাদ।

এই দুয়ের মাঝে শান্ত নির্জন সবুজ অরণ্যানী। জ্যাকব চলেছে পাথুরে ভূমিতে। পশ্চিম দিগন্তে ডুবতে বসেছে সূর্য। স্থির ছায়া নেমে আসছে ম্যাপমোর পাতায় পাতায়।

অদূরে খনি অঞ্চল শেষ রশ্মিতে ঝিকিয়ে ওঠে, ভারী শান্ত পরিবেশ। ঘোড়ার পিঠে চলতে চলতে অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছি।

যখন রাত্রি নামলো তখন আমি নিউক্যাসেল অরণ্যের গভীরে।

সময়টা বসন্ত। বেশ ফুরফুর বাতাস বয়ে চলেছে। মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে গাছের ছায়ায় বসে পড়লাম। এখানে হিংস্র জন্তুর ভয় নেই। বড় জোর দু একটা রোগা নেকড়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

তাদের আমি ভয় করি না। হাতে রাইফেল থাকলে তারা আমায় কিছুই করতে পারবে না। এইসব ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো বন্ধ করেছি। জ্যাকব একটু দূরে মনের আনন্দে ঘাস পাতা চিবোচ্ছে আর থেকে থেকে আমার সাড়া নিচ্ছে।

বাড়ী থেকে খাবার এনেছি। টিফিন কেরিয়ার থেকে খাবার খেয়ে নিলাম। রাতটা কাটাব জ্যাকবের পিঠে। এর আগে আমি কতবার ঘোড়ার পিঠে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছি।

তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুচোখে ঘুম নামবে। পাতা ঝরে যাবে। অরণ্যের হৃদয় থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়বে। সে এক বিরল অভিজ্ঞতা।

এইসব ভাবতে ভাবতে বুঝি তন্দ্রা এসেছিল ক্লান্ত চোখে, জ্যাকবের তীক্ষ্ণ চীৎকারে চমক ভাঙলো আমার।

সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াই। দেখতে পাই পথের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে এক কালো নেকড়ে। অন্ধকারে তার দুপাটি সাদা দাঁত ঝকঝক করছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপতে গেলাম। তারপর কি মনে হতে গুলী করলাম না।

নেকড়েটা এদিক ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে গেল।

সে চলে যাওয়ার পর জ্যাকব চীৎকার থামাল। আর আমার আশঙ্কা হল দূর।

সে রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিয়েছি। ঘাড়ের ওপর লোভী নেকড়ে থাকলে কি ঘুমোনো যায়?

পরদিন ভোর থেকে শুরু হল অন্তহীন চলা।

রুক্ষ ধুলো উড়িয়ে চলেছে আমার ঘোড়া। তৃণাচ্ছাদিত বিবর্ণ অরণ্যের পটভূমি এখন চারপাশের প্রকৃতিকে গ্রাস করেছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ভেড়ার পাল। তারা আপন মনে ঘাস খেতে খেতে চলেছে।

সারাদিন অনেকটা পথ অতিক্রম করে শেষ বিকেলে পৌঁছে গেলাম পাথুরে ভূমিতে। পথটা উঠে গেছে এবড়ো খেবড়ো রুক্ষ অনুর্বর জমিতে। হাঁটতে জ্যাকবের কষ্ট হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে আমার।

মাথায় টুপী, পরণে গা চাপা জ্যাকেট, কাঁধে লং রাইফেল। আমি যেন আমেরিকার কাউবয়। চলেছি বেপরোয়াভাবে।

বনের ফলমুল খেয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব জ্যাকবের পিঠে—এই রকম একটা চিন্তা ছিল মাথায়।

পথটুকু পার হতে চোখে পড়ল এক অন্ধকার গুহা। ঠিক গুহা নয়, পাশাপাশি খাঁজ কাটা কয়েকটি পাথরের মাঝে সুড়ঙ্গ পথ। যার মধ্যে আমি হয়তো ঢুকতে পারবো, কিন্তু জ্যাকবের মাথা গলবে না।

ওকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি। ইঙ্গিতে বলে যাই যে আমি ভেতরে ঢুকছি।

বেচারী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে।

হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ি পাহাড়ের গুহাতে। বিশ্রী একটা গন্ধ এসে নাকে লাগে। তারপর শুনতে পাই কার কান্না।

আলো নেই। প্রথমে অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারছি না। তারপর গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারি যে ওটা হল কোন বন্য জন্তুর আস্তানা। পাহাড়ের গুহাতে বুনো জন্তুরা মনের আনন্দে বাসা বাঁধে।

যদি সে ফিরে এসে দেখে তার নীড়ে আমি ঢুকে পড়েছি তাহলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না। তার মানে এখুনি গুহা ছেড়ে পালাতে হবে।

উঠে দাঁড়াতেই পাথরে মাথা ঠুকে গেল। ভীষণ জোর লেগেছে আমার। আবার বসে পড়লাম।

না, বাচ্চাটার কান্নাটা বুঝি বেড়েই চলেছে। ঠিক কান্না নয়, কান্না মেশানো অদ্ভুত চীৎকার। যার সঙ্গে ক্ষুধার্ত নেকড়ের রক্তাক্ত গর্জনের মিল আছে।

নিউক্যাসেলসের পাহাড়ী গুহায় মানব শিশুর কান্না শুনে চমকে যাব না আমি কি তেমন মেয়ে? হতে পারে আমি ঘোড়ায় চড়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াই। তা বলে কি আমি মানুষ নই?

কান্নার শব্দটাকে অনুসরণ করে বসে বসে হাঁটতে থাকি। অন্ধকারে চোখ অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে। সব কিছু আবছা লাগছে।

সর্বনাশ, এ যে দেখছি নেকড়ের গুহা। অষ্ট্রেলিয়ার অরণ্য অঞ্চলে নেকড়েরা সাধারণতঃ দল বেঁধে বাস করে। তাদের মধ্যে যদি কেউ বুড়ো হয়ে যায় কিংবা যদি তার অসুখ করে তবে সে একলা গুহার মধ্যে চলে আসে।

এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে আমার শত্রু হয় বুড়ো নয় তো অসুস্থ।

কি বোকা আমি! এ কি মানুষ যে বয়স হলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নেকড়ের আবার বয়স কি?

অদূরে শায়িত আছে গোটা চারেক নবজাতক নেকড়ে শিশু। গায়ে গা লাগিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছে তারা। এদিকে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে মানব সন্তান।

ব্যাপারটা এতই অভাবিত যে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। তখন আর মনেই পড়ে না নেকড়ে আসবে। তখন আমি ভাবছি এই রহস্যের সবটুকু আমাকে জানতে হবে।

সাহসে ভর করে এগিয়ে যাই। কি ঘটতে চলেছে সেটা বোঝার মত মানসিক অবস্থা তখন আমার নেই। হাতে রাইফেল

থাকলেও নেকড়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করা যে কতখানি বোকামির কাজ, সেসব আমি একেবারে ভুলেই গেছি।

ছেলেটার কাছে যেতে সে হাতের তালু দিয়ে আমায় আঘাত করল। মানুষের বাচ্চার মত হাত নয় তার, আঙ্গুলগুলো পরস্পরের সঙ্গেই জুড়ে গেছে, বিরাট বিরাট নখ, সব মিলিয়ে যেন বুনো জন্তুর থাবা।

মুহূর্তে আমার গাল কেটে রক্ত ঝরতে থাকে। নিষ্ফল আক্রোশে রাইফেলটা নামিয়ে রাখি। কিছুতেই এখন গুলী করা চলবে না।

ছোট থেকে ভাবতাম একটা সাঙ্ঘাতিক ঘটনার মোকাবিলা করব। বলা যায় ইচ্ছেটাই আমাকে করেছে দুরন্ত যাযাবর। মনের অতৃপ্ত বাসনা আমাকে করেছে ঘর ছাড়া। যে বয়সে অন্য মেয়েরা ব্যস্ত থাকে নানা আনন্দে। সেই কিশোরী বয়সে আমি হয়েছি অরণ্য কন্যা। এটা আমার সখ, আর কিছু নয়।

রুমালটা চেপে ধরি মুখে। সাদা রুমাল কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তে ভিজে গেল। বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে। সারা শরীর বিষিয়ে যেতে পারে। অ্যান্টিটিটেনাস ট্যাবলেট খেলাম।

তারপরেই ঘোড়াটা হঠাৎ ভীষণ জোরে ডেকে উঠল।

অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে কে যেন এসে ঢুকলো গুহায়। বুঝি সম্রাজ্ঞী ফিরছে তার হারানো সাম্রাজ্যে।

লাল চোখ জ্বলছে। যেখানে আমি বসে আছি সেখান থেকে দুতিন হাতের মধ্যে লকলকে জিভে লোভের লালা ঝরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চলমান শয়তান।

আমি চুপচাপ শুয়ে আছি। আগন্তুকের সঙ্গে লড়াই করার কোন ইচ্ছে আমার নেই।

নেকড়েটার বেশ বয়স হয়েছে। তার চলাফেরার ভঙ্গিমাতে ছাপ পড়েছে তার বয়েসের। সে অনেকক্ষণ ধরে আমাকে শুঁকল। তারপর জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করে আমার হাত পা।

ঘেন্না লাগে। তবু বাধা দিতে পারছি না। দেখাই যাক শেষ অবধি কি হয়। যদি জন্তুটা কোন রকম বাড়াবাড়ি করে তাহলে আমার রাইফেল্স আগুন ঢালবেই।

ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে সে যেন আমাকে আদর করতে চায়। ধূর্ত নেকড়ের মন বোঝা বড় দায়? নানা ভাবে ছল করে শিকার ধরাতে তার জুড়ি নেই।

অনেকক্ষণ ধরে আমাকে একনাগাড়ে চাটবার পর মা নেকড়ে বড় করে হাই তুলল। তারপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা সব ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। শুরু হল দুধ খাওয়া।

চারটি নেকড়ে শাবকের সঙ্গে লড়াই করে ক্রমশঃ হাঁপিয়ে উঠছে মানব শিশুটি। অভিমানে দাঁড়িয়ে আছে সে একটু দূরে।

নেকড়ে মায়ের কিন্তু সবদিকে নজর আছে। কিছুটা সময় যেতে না যেতেই সে মানুষের ছেলেটাকে কাছে ডেকে নিল।

আমি চোখ বন্ধ করে মড়ার মত শুয়ে আছি। আর ভাবছি চোখের সামনে যা ঘটে চলেছে তা কি আমার কল্পনা নয়।

দুধ খাওয়া শেষ হতে না হতেই দীর্ঘ এক লাফ দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল নেকড়ে মা। বাচ্চারা যে যার জায়গায় শুয়ে পড়ল। ওরা নয় দুধ খেয়েছে। আমি তো কিছু খাইনি। খিদেয় পেট চুচু করছে।

অনাহারে গুহাতে মরবো নাকি? এখন তো গাছ থেকে ফল পাড়া যাবে না। অবশ্য বনে জঙ্গলে ঘুরলে দিনের পর দিন না খেয়ে কেটে যায়। তাতে আমার কোন কষ্ট হয় না।

একটু বাদে আবার ফিরে এল নেকড়ে মা। দেখি এবার সে মুখে করে নিয়ে এসেছে কয়েকটা মৃত খরগোস। কাঁচা মাংসের লোভে বাচ্চাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তারা সবাই একসঙ্গে মাংস খেতে চায়।

পরম বিস্ময়ে আমি লক্ষ্য করলাম যে মানব শিশুটি উৎসাহের সঙ্গে কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে। চোখে না দেখলে এটা আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। এর আগে অনেক নেকড়ে মায়ের কথা পড়েছি, এই প্রথম চোখের সামনে দেখলাম।

খাওয়া শেষ হতে আমার দিকে এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিল দয়ালু নেকড়ে মা, সে হয়তো আমাকেও তার মেয়ে ভেবেছে।

গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। আমি নাক টিপে শুয়ে থাকি।

তারপর রাতটুকু কেটে গেল ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতার মধ্যে। ভোর হতেই ধড়মড় করে উঠে বসি। সভয়ে চারদিকে তাকাই।

না কেউ কোথাও নেই। গুহাটা ফাঁকা।

পাথরের খাঁজ দিয়ে ভোরের আলো তির্যকভাবে ঢুকছে। তাতেই উদভাসিত হয়েছে পরিবেশ।

ছড়ানো আছে কাঁচা মাংসের টুকরো হাড়। তার মানে রাতে যা দেখেছি সেটা আমার স্বপ্ন নয়। সত্যি সত্যি এখানে বসেছিল বিচিত্র ডিনার।

হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এলাম। জ্যাকব কোথায় গেল? কাছে দূরে সামনে পেছনে তাকাই। সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে সবুজ উপত্যকা। অনেকদূরে উর্বর সমতলভূমি।

জ্যাকব নেই। এবার আমি সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। ও না থাকলে এতটা পথ পার হব কি করে?

বুকের মধ্যে থেকে গুমরে ওঠে কান্না। তবে কি আমাকে নেকড়ের গুহাতে জীবনটা কাটাতে হবে? পারবো না, মরে গেলেও আমি কাঁচা মাংস খেতে পারবো না।

পায়ে পায়ে উঠে যাই টিলার ওপরে। একবার ভাবি, এখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি নীচে, তারপর যা হবার হবে।

পরক্ষণেই মা বাবার কথা মনে পড়ে। মনে হয় আমি যেন অনেকদিন তাদের দেখি নি।

আবার তাকাই খরস্রোতা নদীর দিকে। আমি যে মোটামুটি সাঁতার জানি। যদি এখনই সাঁতার দিতে শুরু করি তাহলে কি সন্ধ্যের আগে সিডনি পৌঁছতে পারবো না?

এই অঞ্চলের নদী-নালাগুলো কোথা দিয়ে গেছে সব আমি জানি।

এটা একটা ছেলে মানুষি কল্পনা। সাঁতার দিয়ে আমি কখনো পার হতে পারবো না। হয়তো আরও গভীর অরণ্যে হারিয়ে যাব। তার চেয়ে এই ভাল, তবুতো মাথা গোঁজার একটা আস্তানা পেয়েছি।

রাইফেলের গায়ে হাত বোলাই। ট্রিগার টেপবার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর কিছু না ভেবে ট্রিগারটা টিপে দিলুম।

এক ঝলক আগুন আর কিছুটা ধোঁয়া নিয়ে ছুটে গেল বুলেট। সেটা বৃথাই আকাশের দিকে ওঠবার চেষ্টা করলো। তারপর কোথায় গেল হারিয়ে।

বুলেটের শব্দ শুনে একপাল ভীতু খরগোস লাফিয়ে লাফিয়ে পার হল মরু পাহাড়ী পথ। সারাদিন আমি ইচ্ছেমতো ঘুরলাম। বুনো ফল আর ঝরনার জল খেয়ে দিনটা দিব্যি কেটে গেল।

সন্ধ্যে হবো হবো। আকাশ জুড়ে সূর্যাস্তের মেঘের মেলা।

চোখে পড়ল সেই অপূর্ব দৃশ্যটা। একপাল ছেলেপুলে নিয়ে ফিরছে সুখী নেকড়ে মা। সারাদিন চরে বেরিয়েছে এখানে ওখানে। শিকার করেছে প্রচুর জন্তু। এবার শুরু হয় রাতের আহার।

প্রত্যেকের মুখেই মৃত পশু ঝুলছে। মানুষের শিশুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চার হাতে পায়ে হাঁটছে। তাকে কাছ থেকে ভালভাবে দেখলাম। দেখে মনে হল সে বুঝি অনেকদিন এখানে আছে। চোয়ালটা ছুঁচলো হয়েছে তার। সারা গায়ে লোম ভর্তি, বয়েস কত হবে। বারো চোদ্দ বছরের কম হবে না।

ধীরে ধীরে ওরা গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। মনে হল নেকড়ে মা বুঝি বুঝতে পেরেছে যে আমি তার শিশু নই।

অনেকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে রইলাম পাহাড়ী টিলায়। জ্যাকবটা যে কোথায় গেল। ও থাকলে আমি এতক্ষণে পাড়ি দিতাম শহরের পথে।

অবশেষে নেমে এল গা ছমছমে রাত। অরণ্য রজনী আপন খেয়ালে রচনা করে তার সিমফনি। যেখানে ঝিঁঝিঁ পোকার অরকেষ্ট্রা, করুণ সুরে গান গায় রাত জাগা পতঙ্গের দল, মাঝে মাঝে বেসুরো ছন্দে ডেকে ওঠে বুনো মোষ।

গুহায় ফিরতেই হল। মনের মধ্যে প্রচণ্ড কৌতূহল। এসে যখন পড়েছি তখন শেষটুকু না দেখে এখান থেকে যাব না।

সেই একই দৃশ্য। কাড়াকাড়ি করে ওরা পশুর মাংস খাচ্ছে। আমি চুপচাপ এককোণে শুয়ে থাকি। আজকে ওরা কেউ আমার দিকে তাকাল না। এই গুহায় নিজেকে মনে হচ্ছে বুঝি অবাঞ্ছিত অতিথি।

অঘটনটা ঘটে গেল তৃতীয় রাতে।

নিয়মমত সূর্য ডুবেছে। বসে আছি পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে। নেকড়ের দল আজ সারাদিন হন্যে কুকুরের মত আশেপাশের অরণ্য চষে ফেলেছে। অথচ কিছুই শিকার জোটেনি।

যেন জ্যাকবের পদধ্বনি শুনতে পেলাম। একটু বাদে দূরের সমতল ভূমিতে ভেসে উঠল তার দীর্ঘ ঋজু চেহারা, বাদামী কেশরে ঠিকরে যাচ্ছে সূর্যাস্তের আলো।

অধীর আনন্দে আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে থাকি।

আমাকে বুঝি দেখতে পেয়েছে জ্যাকব। কদমে কদমে পা ফেলে জোরে আরো জোরে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

মুক্তির পাখীটা মনের খাঁচায় ছটফট করে ওঠে। এবার আমার ছুটি মিলেছে। আমাকে আর নেকড়ের গুহায় থাকতে হবে না।

ঐ দেখা যায় জ্যাকবের মসৃণ দেহ। আর এক মুহূর্ত বাদে আমি তার পিঠে চড়ে বসবো।

পাথরের আড়ালে বুঝি অপেক্ষা করছিল রক্ত লোলুপ পাঁচ জোড়া চোখ।

আমি জানতাম না, এমন নিঃশব্দে তাদের প্রতীক্ষা।

দেখি বাতাসে উড়ন্ত বাদুড়ের মত কটি ছায়া।

তারপর শুনতে পাই আমার প্রিয় ঘোড়াটার শেষ আর্তনাদ।

তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়েছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের পাল।

চোখের নিমেষে জ্যাকবকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল ওরা। এতখানি মাংসে রাতের অন্ধকারে খাওয়াটা দারুণ জমবে।

রাগে দুঃখে আমি যেন পাথর হয়ে গেছি। কিছুই করতে পারলাম না। হাতে রাইফেল থাকা সত্ত্বেও গুলী করতে পারি নি। আমার জ্যাকবকে আমি চোখের ওপর মরতে দিলাম।

চতুর্থ রাত।

সন্ধ্যে থেকেই ঝরা পাতার খসখসানির মধ্যে শোনা গেছে শীতল মৃত্যুর ক্রন্দন। আজও সারাদিন নেকড়ের দল শিকারের সন্ধানে বৃথাই ঘুরেছে। অদূরে শোয়ানো আছে জ্যাকবের হাড়। লোভে পড়ে তাই চিবিয়েছে লোভী বাচ্চার দল।

ছায়াফেলা সন্ধ্যের অন্ধকারে মলিন চাঁদখানি জাগল মাথা উঁচু গাছের আড়ালে। গা ছম ছম অনুভূতি গ্রাস করে আমাকে। বাতাসে যেন নীরব মৃত্যুর ইশারা। ছায়ার মত আশে পাশে ঘুরছে ওরা। ঐ হিংস্র রক্তলোলুপ নেকড়ের দল।

আজ রাতে ওরা কি আমাকে জ্যাকবের মতো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে?

· ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে আমার হাতের রাইফেল।

নেকড়ে মা বুঝি এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায়। আমার বুলেট বিঁধেছে তার আদরের বাচ্চার বুকে। একটি বুলেটে নেকড়ে শাবকের জীবন শেষ হয়ে গেছে।

মাটিতে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে। চারদিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড হুঙ্কার করে ছুটে এল নেকড়ে মা।

পরিস্থিতি বুঝে আমি আবার বন্দুক চালাই। খুব কাছ থেকে পর পর কটা গুলী করতেই নেকড়ে মা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বাকি তিনটি শাবক তখন প্রাণভয়ে গুহার দিকে দৌড়তে শুরু করে।

মানব শিশুটি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। সে ঠিক বুঝতে পারছে না যে এখন কোথায় যাবে।

একবার ভাবি ওকে আমার সঙ্গে নেব। পরক্ষণেই মনে হয় তাহলে বাড়তি ঝামেলা হবে।

বেশী ভাবনা চিন্তা করার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। আমি প্রাণপনে ছুটতে শুরু করি। পাহাড়ী পথ পার হয়ে ছুটে যাই সমতল বনভূমিতে।

ধীরে ধীরে রাতের বয়স বাড়ে। নানা ধরণের বিচিত্র আওয়াজে ভরে গেছে অরণ্য বাতাস। থেকে থেকে বন্য নেকড়ের গা হিম করা গর্জন শুনতে পাচ্ছি।

আমি কিন্তু এক মুহুর্তের জন্যেও থামিনি। ছুটতে ছুটতে দেহটা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল, আর বুঝি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, তখন শুয়ে পড়লাম গাছের নীচে। রাইফেলটা হাতে রেখে ঘুমিয়ে নিলাম কয়েক ঘণ্টা।

ঘুম ভাঙতে দেখি বেশ বেলা হয়ে গেছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের চিহ্ন ধরে ধরে আমি হাঁটতে থাকি গ্রামের দিকে।

পুরো দুটি দিন কিছু না খেয়ে শুধুই হেঁটেছি। তারপর আমাকে দেখতে পায় বনরক্ষী বাহিনীর এক ড্রাইভার। সে জীপে করে যাচ্ছিল। আমি তখন অবসন্ন হয়ে পথের ধারেই শুয়ে ছিলাম।

সে আমাকে জীপে নেয়। তারপর পৌঁছে দেয় ফরেষ্ট অফিসে। সেখান থেকে আমি বাবা-মাকে টেলিগ্রাম করি। আবার সিডনি শহর। চারপাশে পরিচিত প্রিয়জনের মুখ।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে নেকড়ে মায়ের গুহায় সেই কটি দিনের কথা। প্রতি মুহূর্তে ভয়ের থাবা পড়তো আমার পিঠে। তবু যেন কি এক অদ্ভুত নেশা ছিল।

॥ নয় ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঞ্চলে টেকসাস ইনষ্টিটিউট অফ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস-এর পক্ষ থেকে চারজন বিজ্ঞানী সম্প্রতি লাল নেকড়ের সন্ধান করে এলো।

লাল নেকড়ে হল এই প্রজাতির এক বিরলতম প্রাণী। আলাস্কা থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তৃত তুষারাচ্ছন্ন ভূভাগে, ভূমধ্য সাগরের আশে পাশের দেশে, ভারতবর্ষ ও চীনে, আফ্রিকার রুক্ষ মরুপ্রান্তরে যে ধূর্ত নেকড়েদের চঞ্চল পদক্ষেপে সদাসর্বদা ঘুরতে দেখা যায় তারা হল ধুসর অথবা কালো নেকড়ে।

বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাদের নাম ক্যানিস লিউপাস। তারা নাকি কুকুরের জাতের।

লাল নেকড়েরা নাইজার নামে পরিচিত। তারা থাকে তুন্দ্রা অঞ্চলের অরণ্য ভূমিতে। লম্বায় তারা প্রায় আড়াই ফুটের মত, দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট। তাদের ওজন হয় একশো পাউণ্ডের মত। আলাস্কার এক লাল নেকড়ের ওজন ছিল একশো পঁচাত্তর পাউণ্ড— এত বেশী ওজনের লাল নেকড়ে আর কখনও পাওয়া যায় নি।

নাইজার সম্পর্কে এত কথা জানা গেছে টেকসাস ইনষ্টিউটিট রিপোর্ট থেকে। বিজ্ঞানী দল দিনের পর দিন ধরে ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন চলমান লাল নেকড়কে। মাত্র কদিনে তারা কুড়ি থেকে ষাট মাইল পথ অতিক্রম করে। তাই বারে বারেই বাসা বদলায় ক্ষুধার্ত নেকড়েরা।

এই বিচিত্র যাযাবর প্রাণী কিন্তু বনের ডাকে একই জায়গায় বাস করে। তারা নির্দিষ্ট গণ্ডীর ওপারে বেরোতে চায় না।

বিজ্ঞানীদের প্রধান ডক্টর হেলমুট মন্তব্য করেছেন—নেকড়েরা হল কুনো স্বভাবের। এ ব্যাপারে তারা ভাল্লুকের সমগোত্রীয়।

ভাল্লুক যেমন নিজের পরিচিত অরণ্য অঞ্চল থেকে বাইরে বেরোয় না, নেকড়েরাও তেমনি ভাবে দুঃখ কষ্টের মধ্যে বাসভূমিকে আঁকড়ে ধরে।

অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে আলাস্কার অন্তবিহীন শীতের রাতে ক্ষুধার্ত নেকড়েদল করুণভাবে কেঁদে চলেছে। তারা নিজের চর্বি খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। দিনে দিনে আরো রোগা হচ্ছে দেহ। তবু বাইরে যাচ্ছে না।

অচেনা জগত সম্পর্কে এদের মনের কোথায় যেন একটা অজানা ভীতি আছে।

আর এক বিজ্ঞানী নেকড়েদের বাসা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে অসংখ্য ছবি তুলেছেন যা দেখলে বোঝা যাবে নেকড়েরা আবছা অন্ধকারে থাকতে ভালোবাসে।

তারা বাসা বাঁধে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে, কোন প্রাকৃতিক গুহায়, নিদেন পক্ষে ঘন ঝোপের আড়ালে। বাঘ সিংহের ভয়ে তারা এমন তটস্থ থাকে যে বাসার মুখটা রাখে খুব ছোট্ট যাতে শক্তিশালী শত্রু প্রবেশ করতে না পারে।

এমনও দেখা গেছে তিরিশ ফুট নীচু নেকড়ে গুহায় দরজা মাত্র কয়েক ফুটের।

তৃতীয় বিজ্ঞানী জোহান নেকড়েদের শিকার অন্বেষণ নিয়ে কাজ করেছেন। এরা পাখি খরগোস আর হরিণ শিকার করে। দ্রুতগামী খরগোসদের ওপর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার লাফিয়ে পড়ে।

অনেক সময় অন্য পশুর থেকে খাওয়া শিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় নিজেদের মধ্যে।

চতুর্থ বিজ্ঞানী ব্যস্ত ছিলেন নেকড়ে মায়ের সন্ধানে। নাইজার প্রজাতির মধ্যে নেকড়ে জননী খুব বেশী নেই। তাই প্রায় নিরাশ হয়ে উনি হাল ছেড়ে দেন।

অবশেষে সাধনার ফল মিলল।

তাঁবু পড়েছে ফ্লোরিডার চির হরিৎ অরণ্যে।

পরের দিন সকালে পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরতে হবে। যে যার রিপোর্ট লিখতে ব্যস্ত। কিন্তু উনি কি লিখবেন? কদিন ধরে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা সত্ত্বেও একটিও নেকড়ে জননীকে দেখা যায় নি।

মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসেছেন তরুণ বিজ্ঞানী উইলিয়াম ফসটার। সঙ্গে ছিল শিকারী হে। ভারী শক্ত সমর্থ চেহারা তার, স্বভাবে বেপরোয়া। বুনো জন্তু দেখলেই পিস্তল থেকে গুলী ছোঁড়ে, কারুর নিষেধ মানে না।

হঠাৎ হে ছুটে এল তাঁবুর মধ্যে। চীৎকার করে বলল—মিঃ ফসটার, রাইফেল নিয়ে এখুনি আমার সঙ্গে চলে আসুন।

উইলিয়াম দেখলেন, প্রচণ্ড উত্তেজনায় হের চোখ দুটি যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে। তিনি ভাবলেন নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। হে সেটা শিকার করতে চায়। হয়তো তার একার সাহসে কুলোচ্ছে না তাই তার ডাক পড়েছে।

তিনি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে হের সঙ্গে বেরোলেন।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত এসেছে। ফ্লোরিডার অরণ্যে কি এক মায়াবী নীল প্রভা দেখা যাচ্ছে। সব যেন অলৌকিক।

খুব সন্তর্পণে হাঁটছেন ফসটার। হে চলেছে আগে আগে। আর মাঝে মাঝে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে ফসটার ঠিক মত আসছে কি না।

অরণ্য পথে কিছুদূর যাবার পর পাতায় পাতায় বেজে উঠল বিচিত্র খসখস শব্দ। শব্দের দিকে তাক করে পিস্তল বাগিয়ে ধরলেন ফসটার।

সেই শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতে শোনা যায় জলধারার মৃদু কল্লোল। কাছেই আছে ছোট এক বন্য নদী। ভারী শান্ত, নিস্তরঙ্গ, মনে হয়, যেন নীরবে বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে।

ঝোপ থেকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ফসটারের চোখে পড়ল সেই অভাবিত দৃশ্য। তাঁর সমস্ত জীবনের স্বপ্ন ছিল এমন একটি বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। এর জন্যে মনে মনে হেকে দিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ।

কি সেই দৃশ্য, যা দেখে ফসটারের মন ভরে গেল ?

তিনি দেখলেন এক দয়ালু নেকড়ে মা তার আদরের মানব শিশুকে নদীর জল খাওয়াচ্ছে। অন্ধকারে, একটু চাঁদের আলোয়, অপূর্ব নীল জ্যোৎস্নায়, সেই লাল নেকড়ে পরিণত হয়েছে রঙিন মাতৃত্বে।

নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন উইলিয়াম ফসটার। ভাগ্যিস নেকড়ে মা তাদের উপস্থিতির কথা বুঝতে পারে নি। যেরকম সাবধানী সে, তাহলে বোধহয় ছুটে পালাত।

ফসটার দেখলেন, জল খেতে খেতে লাল নেকড়ে মা বার বার মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তার সঙ্গে একটিও নেকড়ে শাবক নেই। মানব শিশুটি যেন নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছে নেকড়ে মায়ের মধ্যে।

অনেকক্ষণ ধরে চললো এই বিচিত্র খেলা। তারপর নেকড়ে মা তার শিশুকে নিয়ে ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল।

ফসটার দেখলেন, শান্ত তটিনীর পাশ দিয়ে ঐ চলেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্রতার প্রতীক, এক লাল নেকড়ে। যাকে দেখে মনে হয় মানুষ এতদিন বৃথাই নেকড়ে সম্পর্কে ভয় পেয়েছে। সে যেন দয়া, মায়া স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে গড়া মানব জননী।

তার পেছু পেছু চার হাত-পা ঘসতে ঘসতে চলেছে মানব শিশু। ওরা দুজন চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর ফসটার বুঝি ফিরে

এলেন মাটির পৃথিবীতে। যেখানে অরণ্য প্রকৃতি নরখাদকের গর্জনে বার বার স্পন্দিত হয়।

হে বলল—মিঃ ফসটার, আশাকরি ছবিটা আপনার মনে থাকবে।

ফসটার বললেন—শুধু মনে থাকবে? ল্যাবরেটারীতে আমি যখন কাজ করবো তখন বার বার আমাকে আনমনা করে দেবে এই অপূর্ব দৃশ্যটি।

ফসটার তাঁর রিপোর্টে নাইজার নেকড়ের আশ্চর্য স্বভাবের কথা লিপিবদ্ধ করেন। যদিও বিজ্ঞানী মহল এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ একমত হতে পারেন নি, তবে ফসটারের বিবরণকে একেবারে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেবার মত শক্তি তাঁদের নেই।

এখনও চলেছে ব্যাপক অনুসন্ধান। ইনষ্টিটিউটের গবেষকরা ব্যস্ত আছেন এমন একটি লাল নেকড়ের সন্ধানে, যার কোলে নির্ভয়ে ঘুমোতে পারে অসহায় মানব শিশু।

দেখা যাক সন্ধান মেলে কি না!

॥ দশ ॥

আফ্রিকার বনাঞ্চলে বাঘ সিংহ হায়না ইত্যাদি পশুর কোন অভাব নেই। কিন্তু বুনো নেকড়ের সন্ধান বড় একটা মেলে না।

দুটি একটি উদ্‌ভ্রান্ত ভবঘুরে শীর্ণ কালো নেকড়েকে সাহারা অঞ্চলের সীমাহীন মরুভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। চোখে তাদের অনাহারের ছাপ, দেহের চামড়া মসৃণ নয়। গর্জন করলে বুক কাঁপে না। তারা যেন ধূর্ত হিংস্র রক্তলোলুপ নেকড়ের ধূসর কঙ্কাল।

সেই আফ্রিকাতে চলেছে নেকড়ে নিয়ে অভিনব গবেষণা।

টিউনিস নামে ছোট্ট একটি বন্দর আছে টিউনিসিয়াতে। যার

সামনে ভূমধ্য সাগরের নীল জলরাশি। সেই ছোট শহরটি নানা কারণে বিজ্ঞানী ও শিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই শহরের বুকে আছে এক চিড়িয়াখানা, যেখানে বেশ কিছু পশুপাখী প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠছে।

তাদের মধ্যে রয়েছে এক নেকড়ে মা, যার নাম দেওয়া হয়েছে সিসিলি।

সিসিলি নাম শুনে অনেকে হয়তো ইটালির বিখ্যাত সিসিলি দ্বীপের কথা ভাবছেন। সত্যি বলতে কি, যে ডাক্তার এই নামকরণ করেছেন তিনি হলেন ইটালীর বাসিন্দা।

সিসিলি জন্মেছে টিউনিস চিড়িয়াখানায়, আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগে। ছোট থেকেই টিউনিস ছিল যেন একটু অন্য ধরণের। স্বভাবে শান্ত প্রকৃতির, সবসময় কাঁচা মাংসের জন্যে লাফালাফি করত না, একমনে খেলা করত কৃত্রিম গুহায়।

দর্শকদের সে বড় একটা পছন্দ করত না। বেশী লোক দেখলে মুখ নীচু করে গুহার মধ্যে ঢুকে যেত। ইটালিয়ান ডাক্তারের সঙ্গে তার ভারী ভাব। ডাক্তার রোজ সকালে নিজের হাতে সিসিলিকে খাবার খাওয়াতেন। বিকেলে একবার করে তার ঘরে ঢুকতেন।

সিসিলির বাবা মা যে প্রজাতি থেকে এসেছে তার নাম টাসমানিয়াম উলফ। স্বভাবে চরিত্রে এরা একটু নির্জীব।

সিসিলিকে ঐ ভাবে পালন করার পেছনে অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল। ইটালীয়ান ডাক্তার চেয়েছিলেন সিসিলিকে সবদিক থেকে শিক্ষিত ও সভ্য করে তুলতে। কেননা পরবর্তীকালে তিনি ওকে উপহার দেবেন এক ফুটফুটে মানব শিশু।

দেখতে দেখতে দিন যায়। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় লোহার খাঁচার মধ্যে। বুনো নেকড়ের সঙ্গে থেকে থেকে তিনিও কেমন বন্য হয়ে গেছেন।

মানুষের সঙ্গ তাঁর আর ভাল লাগে না। এমন কি নিজের বউ

জোহানা আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন না। তাঁর সারাক্ষণের চিন্তা শুধু একটাই—সিসিলির কোলে কে হবে সেই আকাঙ্খিত সন্তান?

সে কথা ভাবতে ভাবতে সারারাত পায়চারি করেন ডাক্তার। তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছে তিনি নেকড়ে মায়ের ব্যাপারে যুগান্তকারী গবেষণা করবেন। বনে জঙ্গলে অনেকে ছুটেছে, অনেকে হানা দিয়েছে দুর্গম প্রান্তরে। ডাক্তার চাইছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে।

তাই তিনি বেছে নিয়েছেন নতুন পন্থা। নিজের খুশীমতো একটি নেকড়ে শাবককে তিনি বড় করবেন, তারপর তার কোলে তুলে দেবেন মানুষের বাচ্চাকে। শুরু হবে এক রোমাঞ্চকর খেলা। নেকড়ে মার স্মৃতিপটে ভাসবে ফেলে আসা অরণ্য জীবনের বন্য ছবি। তার চোখের সামনে থাকবে অসহায় শিশুটি।

ডাক্তার কিছুতেই বিশ্বাস করেন না যে দয়া মায়া ইত্যাদি আকস্মিক ব্যাপার। তিনি প্রমাণ করতে চান উপযুক্ত পরিবেশ পেলে যে কোন স্ত্রী নেকড়েকে জননী করা যেতে পারে।

ধীরে ধীরে বড় হল সিসিলি। ডাক্তার পড়লেন ভীষণ ভাবনায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল—বিশেষ প্রয়োজনে একটি শিশুকে চাই। যার বয়স হবে তিন বছরের মধ্যে। শিশুর কোন ক্ষতি হলে বিজ্ঞাপনদাতা ক্ষতিপূরণের সমস্ত টাকা দিতে প্রস্তুত।

এতে কোন ফল হল না। উল্টে টিউনিসিয়ার লোকেরা ক্ষেপে গিয়ে প্রচার করতে লাগলো যে ডাক্তারের মাথা খারাপ হয়েছে। নাহলে তিনি বুনো জন্তুর কোলে মানুষের শিশুকে সঁপে দিতে পারেন? এ তো জেনে শুনে একটা নিষ্পাপ শিশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া!

টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে কোন লাভ হল না। এখন কি করা যায়? আর কদিনের মধ্যে সিসিলির সামনে বাচ্চাকে হাজির না করা হলে

তাঁর সমস্ত পরিশ্রম বিফল হবে। কেননা সিসিলি এবার মা হতে চায়। তার আচরণে ফুটে উঠেছে জননীর স্নেহ। এই অবস্থাটা কেটে গেলে তাকে আর বশে আনা যাবে না।

একদিন ভাবতে ভাবতে ডাক্তার বুঝি অচেতন, হঠাৎ তাঁর কাঁধে কার হাতের স্পর্শ পড়ল। অবাক হয়ে দেখেন স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় না, তাই আশ্চর্য হলেন তিনি।

শুকনো কণ্ঠে বললেন—কি ব্যাপার?

তিনি জানেন জোহানা খামখেয়ালী গবেষণাতে মোটেই খুশী নন। তাই ভাবলেন, হয়তো সে রাগ দেখাতে এসেছে।

জোহানা তাঁকে ডাকল হাতের ইশারায়। ঘর ছেড়ে বারান্দায় গেলেন তিনি। দেখলেন ছোট্ট বিছানায় শুয়ে আছে তাঁর তিন বছরের ছোট ছেলে স্যাম। নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে সে। দেখে ভারী মায়া লাগলো ডাক্তারের।

কিন্তু জোহানা তাঁকে কেন এমনভাবে ডেকে আনলো?

তিনি ঘাড় কাত করে দেখলেন। সে ফিস ফিস করে বলল—শোন, স্যামকে দিয়ে কি তোমার কাজ চলতে পারে?

চমকে গেলেন ডাক্তার। একি বলছে জোহানা? মা হয়ে সে নিজের ছেলেকে তুলে দিচ্ছে হিংস্র নেকড়ের মুখে?

চিরজীবন যার প্রতি ছিল বিতৃষ্ণা, এই মুহূর্তে সে হল তাঁর আপনজন। তিনি অবাক হয়ে তাকালেন। দেখলেন জোহানার ঠোঁটের কোণে কি বিচিত্র হাসি। এতটুকু ভয় পায় নি সে।

তিনি কাঁপা গলায় বললেন—তুমি সত্যি বলছ? জোহানা জবাব দিল—হ্যাঁ।

—একবার ভেবে দেখতো স্যামের কথা। সিসিলি হয়তো তাকে মেরেই ফেলবে।

—তবু বলছি, ওকে তুমি নাও। যদি সফল হও তাহলে আমার যে কি আনন্দ হবে। আমি বোঝাতে পারবো না।

পরের দিন দুপুরে ডাক্তার স্যামকে নিয়ে এলেন নেকড়ের খাঁচায়। দূর থেকে দেখছিল জোহানা। খাঁচাটা খুলতেই সিসিলি ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করলো। সে বুঝতে পেরেছে অপরিচিত কেউ এখানে প্রবেশ করেছে।

সামনে নেকড়ে দেখে ভয়ে চীৎকার করে ওঠে স্যাম। মা মা বলে ডাকতে থাকে। ডাক্তার একবার ভাবলেন এই খেলা বন্ধ করে দেবেন। দূরে দাঁড়িয়ে আছে জোহানা, তাকিয়ে আছে স্যামের দিকে।

স্যামকে সেখানে রেখে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। শেষ মুহূর্ত অবধি স্যাম তাঁর হাত আঁকড়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বলছিল—ড্যাডি, আমাকে এখানে ফেলে যেও না। ফেলে যেও না।

একটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। ডাক্তারের সমস্ত চেতনা বুঝি লোপ পেয়েছে। শুধু শোনা যায় হৃৎস্পন্দনের আওয়াজ। জোহানা আর তাকাতে পারছে না। হাতের তালু দিয়ে চোখ ঢেকেছে সে।

সিসিলি উঠে এল। বার কয়েক পায়চারি করল। তারপর খিঁচিয়ে ওঠে তার দুপাটি সরু দাঁতের সারি। স্যাম খাঁচার ওপর মাথা ঠুকছে। লোহার গরাদে বৃথাই ব্যথা পাচ্ছে সে।

সিসিলি উঠে এসে দাঁড়াল স্যামের গা ঘেঁসে। তারপর জিভ দিয়ে তাকে চাটতে শুরু করল।

বাঁ হাত পকেট থেকে তুলে নিলেন ডাক্তার। পিস্তলের প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে ভয়াবহ মুহূর্তটা কেটে গেছে। সিসিলি যখন একবার চাটতে শুরু করেছে তখন আর ভয় নেই। স্যামকে সে বন্ধু ভাবেই গ্রহণ করেছে।

নেকড়ের খাঁচায় স্যাম ছিল প্রায় ঘণ্টাখানেক। তারপর তাকে নিয়ে এসেছেন ডাক্তার। প্রথম দিকে মুক্তি পাবে স্যাম। পরে তাকে আর খাঁচার বাইরে আনা হবে না।

দ্বিতীয় দিন স্যাম কিন্তু আগের মত ছটফট করল না। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল জোহানা। পকেটের পিস্তলে হাত রেখে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করলেন ডাক্তার। স্যাম আর সিসিলির মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে মধুর সম্পর্ক।

আগের দিনের মতো সিসিলি স্যামের হাত-পা চেটে সোহাগ দেখাল।

এমনভাবে কেটে যায় একটি একটি করে তেরোটা দিন, প্রতিদিনই দু ঘণ্টা করে স্যাম থাকে সিসিলির খাঁচায়। ধীরে ধীরে তার মধ্যে বন্য স্বভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এখন সে আর মোটেই কাঁদে না, কেমন যেন হয়ে গেছে সে।

ডাক্তার দেখেন, জোহানা তাকিয়ে আছে স্যামের দিকে। স্যাম কিন্তু আগের মত মায়ের কাছে ছুটে আসছে না।

তিনি জানেন এমনভাবে বন্য জীবনের মাদকতা এসে গ্রাস করবে স্যামকে। সে হবে সিসিলির পালিত পুত্র, এক বিচিত্র বালক, হয়তো এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন ডাক্তার। কিন্তু জোহানাকে জবাব দেবার মত কৈফিয়ত তাঁর আছে কি?

টিউনিস চিড়িয়াখানায় এখন অভিনীত হচ্ছে যে আশ্চর্য নাটক, আমরা রুদ্ধ বিস্ময়ে অপেক্ষা করছি সেই নাটকের শেষ দৃশ্য দেখবো বলে। যদি ডাক্তার প্রমাণ করতে পারেন, যে কোন স্ত্রী-নেকড়েকে নেকড়ে জননীতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে সেটা হবে প্রাণী বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার।

কিন্তু পৃথিবীর মানুষ কি কোনদিন মনে রাখবে মা জোহানার আত্মত্যাগের কথা? এমনভাবেই যুগে যুগে এই পৃথিবীতে এসেছে জোহানার মত মায়েরা, যারা প্রিয় পুত্র স্যামেদের তুলে দিয়েছে সোনালী ভবিষ্যতের জন্যে।

মানুষ তাদের ভুলতে পারে, ভুলবে না ইতিহাস।

॥ এগারো ॥

ভদ্রলোকের নাম নেলসন। বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেছে। এখনও বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা, চিবুকে দৃঢ়তার কাঠিন্য। প্রতিদিন সকালে উঠে মাইল দশেক হাঁটেন তিনি। রাতে শোবার আগে আরাম কেদারায় বসে ঘণ্টা তিনেক শিকারের বই পড়েন।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি রাতারাতি সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী আর শিকারীদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন।

এর কারণটা কি? দেখা যাক, নেলসনের কাছ থেকে আমরা কী সঙ্কেত পাই।

বারো বছর বয়েসে নেলসন ছিলেন ব্রিটিশ রাইফেলসের এক সাধারণ সৈনিক। তখন পৃথিবী জুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন। সেই আগুনে ঝলসে গেছে কত তাজা তরুণ প্রাণ। নেলসন ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

বারো বছরের বালক নেলসন দেশের সেবায় এসেছেন উত্তর আফ্রিকায়। মরুভূমি আচ্ছাদিত জলহীন শুকনো পার্বত্য প্রান্তরে ঢাকা এই ভূভাগ। এখানে মধ্য দিনে জীবন হয় অসহ্য। আবার রাতে নেমে আসে শীতল বাতাসের শিহরণ। তারই মধ্যে কোন-রকমে দিন কাটান বালক নেলসন।

সেই বয়েস থেকে নেলসন নতুন এক নেশায় ওঠেন মেতে। সেটা হল শিকারের নেশা। ঠিক শিকার নয়, কোন জন্তুকে হত্যা না করে তিনি তার সম্পর্কে সবকিছু জানবার চেষ্টা করতেন। বন্য প্রাণীদের সম্পর্কে ছিল তাঁর অসীম কৌতূহল।

জংলাভূমিতে গোল গোল পায়ের চিহ্ন পড়েছে, গভীর রাতে সেই চিহ্ন ধরে ধরে নেলসন চলেছেন বুনো জন্তুর বাসার সন্ধানে।

এমনভাবে তিনি উত্তর আফ্রিকার পশুপাখী সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করেন।

শুধু তথ্য নয়, তাঁর সংগ্রহে ছিল পশুপক্ষীর নানা স্মৃতি। হয়তো দেখলেন রঙ্গীন পাখীর পালক, কিংবা দুরন্ত বাঘের চামড়া, অসট্রিচের ডিম আর যাযাবর পাখীর পাখনা। সঙ্গে সঙ্গে তুলে রাখলেন ব্যক্তিগত জাদুঘরে।

তারপর একদিন শেষ হল নেলসনের সৈনিক জীবন। ছিলেন সৈনিক, বিধাতার নিয়মে এবার হলেন নাবিক। মনে মনে বুঝি ধন্যবাদ দিলেন প্রকৃতিকে। কেননা নাবিক জীবনে মানুষ সারা দেশকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে পারে। বৃটিশ শিপিং কোম্পানীর জাহাজে চড়ে নেলসন অসংখ্যবার পাড়ি দিলেন তরঙ্গ বিধৌত আটলান্টিক, পার হলেন প্রশান্ত মহাসাগর। কায়রো, হংকং, এডেন, মেলবোর্ণ অথবা কলম্বো বন্দরের সঙ্গে হল তাঁর নিবিড় সখ্যতা।

যখনই কোন নতুন দেশে ঢোকেন, তখনই সেখানকার পশুপাখী সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করতেন। এমনভাবে তাঁর মধ্যে পড়াশোনার নেশা এসে যায়। পড়তে পড়তে তিনি আবিষ্কার করলেন নেকড়ে বালকের অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তাঁর অন্বেষণ। সত্যিই কি নেকড়ে বালক আছে? না কি সবটাই লেখকের কল্পনা বিলাস?

এই প্রশ্নের উত্তর তাঁকে জানতেই হবে।

আজ বিয়াল্লিশ বছর কেটে গেছে। সেদিনের সুঠাম যুবক নেলসন পরিণত হয়েছেন শীর্ণ এক বৃদ্ধতে। তবু বিন্দুমাত্র কমেনি তাঁর জ্ঞান স্পৃহা। আগের মত এখনো তিনি সুযোগ পেলে ছুটে যান নেকড়ে মায়ের সন্ধানে। সারা জীবন ধরে নেকড়ে বালকদের নিয়ে গবেষণা করেছেন নেলসন। তাঁর অভিজ্ঞতার দুষ্প্রাপ্য খাতায় লেখা আছে আড়াইশো জন নেকড়ে বালকের অবিশ্বাস্য কাহিনী। তাদের মধ্যে ভারতের নেকড়ে শিশুর সংখ্যা হল চোদ্দ।

নেলসন থাকেন মিডলসেক্সের নির্জন গ্রামে। একা মানুষ তিনি। আপন বলতে পোষা কুকুর। আর আছে অরণ্যের হাজার স্মৃতি। ডাইরীর পাতায় নেলসন এখনো লিখে চলেন নেকড়ে বালকের কথা। আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রকাশকদের অনুরোধেও তিনি তাঁর ডাইরীটি বই আকারে ছাপতে দেননি। এ যেন তাঁর গোপন অহংকার।

অথচ মানুষ হিসেবে নেলসন মোটেই দাম্ভিক নন। নিজের কাজ সম্পর্কে এতটুকু ঈর্ষা নেই তাঁর মনে। যে কোন উৎসাহী দর্শকের জন্যে ঐ দুর্লভ মিউজিয়ামের দরজা সব সময় খোলা। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওখানে ভীড় করে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। আসে অফিসের কর্মচারীরা, বিশিষ্ট শিকারী এবং বিজ্ঞানীরা।

তাদের সবার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলেন নেলসন।

নেলসনের বিচিত্র খাতায় নেকড়ে বালকের যে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা আমাদের বিস্মিত করে দেয়। এখানে আছে মধ্য আফ্রিকার ভয়ঙ্কর নেকড়ে বালক জুয়ানার নাম। যে মানুষ দেখলেই তার ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিত। যার জন্যে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

শুধু জুয়ানোর মত বিদঘুটে নেকড়ে বালকেরা যে নেলসনের খাতায় স্থান পেয়েছে তা নয়। সেখানে আছে ভদ্র নেকড়ে শিশু ক্রিষ্টির নাম। মানুষের ভয়ে যেখানে ক্রিষ্টি জড়সড় হয়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে করুণভাবে কাঁদতো।

আর এক নেকড়ে বালক ভবিষ্যতে তার মাকে চিনতে পারে। কিন্তু মায়ের কোলে ফিরতে পারে না। এই ট্রাজেডির কথা সুন্দর ভাবে দিয়েছেন প্রাণী দরদী নেলসন।

তাঁর বিবরণীতে আমাদের পরিচিত রামু, বুনো, বাদশার কথা আছে। আছে মালয় অরণ্যের অসহায় জিক ও জ্যাকের নাম।

জাম্বোকেও তিনি ভুলতে পারেন নি। ভুলতে পারেন নি রোর ছবির নায়ককে। ওরা সবাই বারবার তাঁর হৃদয়কে করেছে ভারাক্রান্ত। তিনি যে ওদের জন্যে সব সময় চিন্তা করেন।

নেলসনের অসমাপ্ত ডাইরীটি প্রাণী বিজ্ঞানীরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকেন। কেননা এর মধ্যে নেকড়ে বালকের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তা আর অন্য কোথায় নেই। নেলসন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যাটার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এর মধ্যে আরোপ করেছেন বিচ্ছিন্নতা ও নির্জনতাকে। নেলসন প্রমাণ করতে চান, নেকড়ে শিশুদের হাবভাবের সঙ্গে বাবা মার অনাদর-অবহেলায় পালিত একগুঁয়ে জেদী শিশুদের অনেক মিল আছে।

নেলসনের ডাইরি পড়লে বহু আকর্ষণীয় খবর পাওয়া যায়। যেমন, তিনি যতগুলো নেকড়ে বালককে দেখেছেন তার মধ্যে বেশীর ভাগই আর সামাজিক জীবনে ফিরতে পারে নি। এদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন কথা বলতে শেখেনি। আড়াইশো ঘটনার মধ্যে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে তিনি নেকড়ে বালকের মুখে মানব শব্দ শুনতে পান।

আরেকটি মজার তথ্য আছে। সেটি হল—নেকড়ে বালকের স্বল্পস্থায়ী জীবনের খবর। ধরা পড়ার পর তারা বেশীদিন বাঁচে না। সাধারণতঃ এই অবস্থায় তাদের আয়ু ছ থেকে ছমাসের মত। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা অবশ্য পাঁচ বছর অবধি বেঁচে থাকে। যে নেকড়ে বালকটি সবচেয়ে বেশীদিন বেঁচেছিল সে হল আমাদের রামু।

এ কথার উল্লেখ আছে নেলসনের বইতে। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, গুহায় থাকলে নেকড়ে বালক বেশী দিন বাঁচবে? না কি মানবিক পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে?

নেলসন বলতে চান মুক্ত স্বাধীন জীবনের কোন নির্ভরতা নেই। যে কোন মুহূর্তে অসহায় নিরস্ত্র নেকড়ে বালক ক্ষুধার্ত প্রাণীর শিকার হয়ে যায়। বাইরে থাকলে তাদের আর এই অবস্থায় পড়তে হয় না।

নেলসন আরো দেখেছেন পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এই ঘটনার ব্যাপকতা বেশী। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ফ্রান্সে যত বেশী নেকড়ে বালক চোখে পড়ে তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

অবশ্য এর কোন কারণ তিনি দেখতে পান নি।

নেকড়ে বালকদের আবিষ্কার করার বিবরণীগুলো কম আকর্ষণীয় নয়। অনেক সময় এমন দেখা গেছে যে নেকড়ে জননী তার সুখী পরিবার নিয়ে শিকারীর ঘাড়ের ওপর এসে গেছে। কখনো সে আবার শিকারীকে গ্রাহ্যই করেনি।

তবে সবকটি ক্ষেত্রে মাতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে। মানব শিশুকে বাঁচারার জন্যে নেকড়ে জননী সবকিছু নিয়েছে মাথা পেতে। কোন সময় তারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতেও দ্বিধা করেনি।

নেলসনের লেখা বিবরণীর প্রতিটি পাতা অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি যে বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কে যেসব তথ্য জোগাড় করেছেন, তা তাঁকে মানব অন্বেষণের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

॥ বারো ॥

না, এবার আর চার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দেওয়া নেকড়ে বালকের বিচিত্র কথা নয়। নয় কোন মানবী কন্যার বন্য পশুতে রূপান্তের রুদ্ধশ্বাস ইতিবৃত্ত।

এবার আমরা শুনবো প্রকৃতির এক রহস্যময় ঘটনা।

যুগ যুগ ধরে সংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের মন কল্পনা করেছে কোন পূর্ণবয়স্ক মানুষ নাকি ইচ্ছামত বন্য প্রাণীতে পরিণত হতে পারে।

তাদের এই অদ্ভুত চিন্তার অন্তরালে আছে হিংস্র বন্য প্রাণী

সম্পর্কে ভীতি। পুরানের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দেখি এমন অনেক মানুষকে তারা নাকি ইচ্ছেমত পরিণত হয়েছিল নরখাদকে।

আমাদের দেশে বাঘের দেবতা দখিণ রায় অথবা সাপের দেবীর মধ্যে এই কল্পনার প্রতিফলন দেখা যেত।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র পুরাণ কথার ছড়িয়ে আছে মানব পশুর অসংখ্য কাহিনী। ইংলণ্ডের মানুষ কল্পনা করত যে বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ গুণ সম্পন্ন যুবতীরা পরিণত হয় রক্ত লোলুপ বাঘিনীতে। তখন নাকি তারা হয়ে ওঠে মানুষ খেকো। তাদের চেহারার গঠন যায় বদলে। দাঁতের সারি ঝক ঝক করে। তারা প্রিয়জনের দেহ থেকে পান করে উষ্ণ রুধির।

আফ্রিকার মানুষের মধ্যে এই সংস্কারের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশী। অবশ্য এর কারণ আছে। আফ্রিকার সাধারণ মানুষকে খালি হাতে লড়াই করতে হয়েছে বীভৎস ভয়ঙ্কর বন্য জন্তুর সঙ্গে। যখন তারা সেই অসম যুদ্ধে হয়েছে পরাজিত তখনই শত্রুর দেহে অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা করেছে।

মিশরীয় গল্পে পশুর রূপধারী দেবতার উল্লেখ আছে। বুবাস্তিস শহরে স্থাপিত আছে বিড়াল মুখী দেবী হরেম পোলিসের মূর্তি। আলেকজান্দ্রিয়ার কামেবেসে আছে ষাঁড়ের মত আকৃতিযুক্ত হোলিও পোলিস, মেমফিস, হারমনসিস ও থীবসের মূর্তি। দুষ্ট আত্মার প্রতীক হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে জলহস্তী, বেজী, শিয়াল ও বাজপাখীকে। জলহস্তীর বিরাটত্ব, বেজীর চঞ্চলতা, শিয়ালের ধূর্ততা আর বাজপাখীর ক্ষিপ্রতাকে তারা সম্মান করেছে।

তাদের চোখে কুমীর ছিল ভীতিজনক প্রাণী। আর কেউটেকে তারা মনে করত রাজকীয় রুক্ষতার প্রতীক। সভ্যতার জয়যাত্রায় মিশর যখন এগিয়ে চলেছে দৃঢ়পায়ে তখনও তাদের মধ্যে এই সংস্কার শেষ হয়নি। পরবর্তী কালে তারা ভেড়ার মাথাযুক্ত আমেনের কল্পনা

করেছে। গাভীর মাথাযুক্ত তাইস্‌সিসের ছবি এঁকেছে। আর জলদেবতা সেবেকের চেহারায় কুমীরের শরীর জুড়েছে।

এখানে একটা বিষয় আমাদের অবাক করে, তা হলো আফ্রিকার কুসংস্কারে নেকড়ের অনুপস্থিতি। এর কারণ আর কিছুই নয়, আফ্রিকা মহাদেশের দুর্ভেদ্য অরণ্যে বাঘ, সিংহ, হায়না জলহস্তী প্রভৃতির সন্ধান মেলে কিন্তু নেকড়ে বড় একটা দেখা যায় না। তাই তাদের চোখে নেকড়ের কোন কাল্পনিক ছবি নেই।

আবার আমরা যদি তাকাই ইউরোপ থেকে আমেরিকার দিকে তাহলে দেখতে পাব ভয়াল ভীষণ বিভীষিকার প্রতীক এই কালো শয়তান মানুষকে কিভাবে ভীত সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত করেছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যে নেকড়ে এসেছে, কালজয়ী লেখকদের রচনায় বার বার শোনা গেছে নেকড়ের পদধ্বনি। যেমন এডগার অ্যালান পো, ব্ল্যাক উড, ডবলু জ্যাকব প্রভৃতি নেকড়ে নিয়ে ভৌতিক গল্প লিখেছেন।

আয়ারল্যাণ্ডের অশুভ ক্রন্দনকারী অপদেবতা ব্যানসী নাকি নেকড়ের মত আকৃতি ধরে চলাফেরা করে। জার্মানীর পোলটার গার্ট হল খুনস্যুটে এবং বাস্তুভূত। সেও অমাবস্যার রাতে নেকড়ে হয়ে যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে সব নিগ্রোরা বাস করে তাদের জীবিত শব জোমবিক কখনো কখনো নেকড়ের আকৃতি ধারণ করে।

হয়তো এসব ভাবনা থেকেই ইউরোপে আমেরিকায় মানুষের নেকড়েতে রূপান্তরের মতবাদ প্রচলিত হয়েছে।

পৃথিবীর প্রথম তথ্য নির্ভর ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনায় এই বিচিত্র পন্থায় উল্লেখ আছে। গ্রীস দেশের ঐ বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক মনে করতেন যে আফ্রিকার নেহারি উপজাতির লোকেরা বছরের কটি দিন নেকড়েতে পরিণত হয়। তিনি তাঁর এই মতবাদের সমর্থনে অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন।

মহান রোমান কবি ভার্জিলের কবিতায় নেকড়ে বালকের উল্লেখ আছে। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের একশো বছর আগে অর্থাৎ আজ থেকে দু হাজার বছর আগে ইটালীর পার্বত্য অরণ্যে নাকি এমন বিষাক্ত গুল্ম লতা জন্মাতো যার রস পান করলে মানুষ ধীরে ধীরে নেকড়ে হয়ে যায়।

ভার্জিলের কবিতায় এই অবিশ্বাস্য রূপান্তরের অদ্ভুত বর্ণনা আছে।

চতুর্থ পঞ্চাশ শতকে সেণ্ট অগষ্টাইন নামে এক যাদুকর ছিলেন। তিনি যাদুভঙ্গীর সাহায্যে সুস্থ সবল মানুষকে হিংস্র ক্ষুধার্ত নেকড়েতে পরিণত করতেন। সেণ্ট অগষ্টাইনের চারপাশে লেগে থাকতো উন্মুখ মানুষের ভীড়।

এ তো গেল সভ্যতার আদিযুগের কথা। তারপর এল মধ্যযুগ। তখনও কিন্তু মানুষ তার মন থেকে এই সংস্কারকে একেবারে বিলুপ্ত করতে পারেনি।

শুরু হল ইটালীর বিখ্যাত নবজাগরণ বা রেনেসাঁস, হল ফরাসী দেশের মহান বিপ্লব। সারা পৃথিবীর জাগ্রত মানব সত্তা তখন নতুন মূল্যবোধে উদ্ভাসিত। যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু অশুভ, তার বিরুদ্ধে সে ঘোষণা করবে জেহাদ। শুরু হল দম বন্ধ করে চেপে বসে থাকা বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই।

এর পাশাপাশি মানুষ তার মনের কোণে পুষে রাখলো নেকড়ে মানবের অস্তিত্ব। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট উত্তাল হল এক বিতর্কিত প্রশ্নে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ফরাসী দেশের আইনজ্ঞদের পরামর্শ চাইলেন, তাঁরা যেন অবিলম্বে নেকড়ে মানবের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের চূড়ান্ত মত দেন।

শুরু হল ফরাসী আইনসভার নিদ্রাবিহীন অধিবেশন। উত্তপ্ত আলোচনার শেষে কেউ কিন্তু চূড়ান্ত জবাব দিতে পারলেন না। তাই ঘোষণা করা হল, ফ্রেঞ্চে-কমটে (Frenche-Comote) এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সেজন্য তারা দুঃখিত।

ইংল্যাণ্ডের বুকে ঘটে গেছে যুগান্তকারী শিল্প বিপ্লব। তবুও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের মানুষ নেকড়ে মানবের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে গেল এক গুজব। বাবা-মায়েরা বিকেলের পর ছেলেদের ঘরে রাখলো তালাবন্দী করে, সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। রাত আটটায় মস্কোর রাজপথ যেন নির্জন বনস্থলী।

দরজার খিল এঁটে, জানলা বন্ধ করে রাশিয়ার মানুষ বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে কোন অশুভ আত্মার অপেক্ষা করছে। শীতের রাতের হিমেল হাওয়ার পাঁজর ভেদ করে ঐ বুঝি শোনা যায় তার দীর্ঘশ্বাস। ফারনেসের জ্বলন্ত কয়লার মাঝে যেন ক্ষণিকের জন্য জেগে ওঠে রক্ত লাল দুটি চোখ, আবার তারা মিলিয়ে যায়।

কি সেই গুজব? যা এত মানুষের মন শঙ্কা. শিহরিত করে তুলছে!

এর একটা পটভূমি আছে। বেশ কিছুদিন ধরে রাশিয়ার সঙ্গে সুইডেনের লড়াই হয়ে গেল। সেই যুদ্ধে জিতেছে রাশিয়া; জয়ের পুরস্কার হিসেবে সঙ্গে এনেছে হাজার হাজার সুইডিস বন্দীকে।

তাদের তারা নিঃসঙ্গ নির্বাসন দিয়েছে তুষার আচ্ছাদিত সাইবেরিয়ায়। যেখানে মানুষ নির্জনতার অভিশাপে ধীরে ধীরে পরিণত হবে মৃতার্ত প্রাণে। চোখের জল ফেললে কেউ দেখবে না। দীর্ঘশ্বাস শোনার মত একটি সাক্ষীও নেই।

এর চেয়ে অনেক ভালো গিলোটিনের ঝকঝকে ইস্পাতে গলা রাখা, বুলেটের আঘাতে হৃৎপিণ্ডকে রক্তাক্ত করা অথবা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর ডাক শোনা।

সুদূর সাইবেরিয়ার, নিরন্তর তুষার পাতের মধ্যে, সকলের চোখের আড়ালে একটি একটি করে জীবনের দীপ নিভে যাবে। মৃত্যুর মুহূর্তেও তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে না কোন সমব্যথী। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে?

তাই বুঝি উত্তর থেকে ছুটে আসা হিমশীতল বাতাস বয়ে আনছে মৃত সুইডিস বন্দীদের আত্মাকে। ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ্য করলেন আলেকসি। বেশ হাসিখুশী মানুষ তিনি। নিজের বিরাট একটা আখের ক্ষেত আছে। আছে পুকুর ভরা মাছ। আর কয়েকটি ডিঙ্গি নৌকো। মনের আনন্দে আলেকসি সারাদিন ধরে ক্ষেতে চাষ করেন। ছুটির দিনে ডিঙ্গি ভাসান জলে। এমনভাবে কেটে যায়।

সেদিন সন্ধ্যে হয়েছে। শহর থেকে ফিরছেন আলেক্সি। অনেকটা পথ, হাঁটতে হাঁটতে বেশ ক্লান্ত হয়েছেন তিনি।

বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কি যেন একটা ছায়ার মত সরে গেল না? কি হতে পারে, আশে পাশে ঝোপ ঝাড নেই। লকলক করছে ভরন্ত গমগাছ।

আরেকটু এগিয়ে এলেন আলেক্সি। ভাবলেন হয়তো বুনো কুকুর-টুকুর হবে। তারপর সেই জন্তুটা ঘাড় কাত করে তাঁর দিকে একবার তাকাল। চমকে গেলেন আলেক্সি। এ কি দেখছেন তিনি?

কুকুর নয়, এ হল এক কালো নেকড়ে। তাঁকে দেখেই দ্রুত সে পালিয়ে গেল।

কাছে পিঠে কোন জঙ্গল নেই। গ্রাম শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে শহর। তাহলে?

গ্রামের মধ্যে হিংস্র নেকড়ে চরে বেড়াচ্ছে, এটা তো ভালো কথা নয়। যখন তখন কাউকে আক্রমণ করতে পারে। আলেক্সি ছুটলেন গ্রামের মোড়লের কাছে। গিয়ে দেখেন সেখানে ছোট খাট ভীড় জমেছে। সবাই উত্তেজিতভাবে কি যেন বলতে চায়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করলেন তিনি।

কি আশ্চর্য? ওরা সবাই যেন তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে।

বারো বছরের ফুটফুটে মেয়ে লিণ্ডা কাঁদতে কাঁদতে বলছে তার নিজের চোখে দেখা নেকড়ের কথা। আজ বিকেলে সে তার ছোট ভাইকে নিয়ে আল ধরে হাঁটছিল। বুড়ী কিছেফের খামার বাড়ির

ওপর টান টান হয়ে শুয়ে আছে এক বিরাট নেকড়ে। ওদের দেখে নেকড়েটা বিরাট হাঁ করে হাই তুলল। তারপর লম্ফ দিয়ে পালিয়ে গেল।

সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে লিণ্ডা এসেছে মোড়লের কাছে।

বিশ বছরের তাজা যুবক ভলস্কাই যা শোনাল তাতে সবার হাত-পা বুঝি পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে। ভলস্কাই শহরের শ্রমিক। ভোরবেলা সাইকেলে চড়ে কারখানায় যায়। ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয় তার। আজ যখন সে কারখানায় যাচ্ছিল তখন দেখে এক বালক নেকড়ে গ্রামের কবরখানার ওপর বসে আছে।

তখনো কুয়াশা কাটেনি। থমথম করছে চারপাশ। সে ভাবলো, না, আমার চোখের ভুল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে আবার তাকাল ভলস্কাই। ঐ তো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! চার চারটি নেকড়ে আরাম করে বসে আছে।

সাইকেলে চড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ভলস্কাই। কারখানায় গিয়ে বলে মনটা তার ভাল নেই। বন্ধু জোসেফকে কথাটা বলতেই সে হো হো করে হেসে উঠল।

তার পিঠ চাপড়ে বলল—ব্রাদার, তুমি কি সাত সকালে স্বপ্ন টপ্ন দেখ নাকি? গ্রামের মধ্যে নেকড়ে ঘুমোচ্ছে? তোমার কি মাথা খারাপ?

রাতের অন্ধকারে ঐ কবরখানার পাশ দিয়ে আসতে হবে, কথাটা ভাবতেই ভলস্কাই চমকে ওঠে। ভূতে তার ভয় নেই। কিন্তু চার চারটি নেকড়ে যদি তার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে সে কি করবে?

তাই বিকেল বিকেল চলে এলো কারখানা থেকে। হাজির হয়েছে মোড়লের দরবারে।

আলেক্সি, লিণ্ডা, ভলস্কাইয়ের মত অন্য দুচার জন গ্রামবাসী তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলল। সব শুনে-টুনে মোড়ল রায় দিলেন

—ও আমার মনে হচ্ছে ওরা সত্যিকারের নেকড়ে নয়। আমি এইমাত্র আমার ভাইপোকে ওখানে পাঠাই। সে কিন্তু চারটে কেন, একটা নেকড়েও দেখতে পায়নি।

—তাহলে, আমি কি মিথ্যে বলছি?

ভলস্কাই চীৎকার করে।

মোড়ল তাকে শান্ত করে বলে—আহা, তুমি চটছো কেন? এমন তো হতে পারে ওরা নেকড়ের ছদ্মবেশে কোন শয়তান?

এ ধারণাটা কারুর মনে আসেনি। সবাই যেন একসঙ্গে চমকে ওঠে। সেদিনের সভায় ঠিক হল সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা যে যার ঘরে খিল এঁটে বসে থাকবে। রাতে আর ক্ষেত পাহারা দেবার দরকার নেই। যদি গভীর রাতে কোন অতিথি এসে দরজায় করাঘাত করে তবে কেউ যেন দরজা না খোলে।

নানা কথা আলোচনা করতে করতে ওরা ফিরলো যে যার ঘরে।

পরের দিন এই দৃশ্যটা ছড়িয়ে পড়ল আশে পাশের গ্রামে। পথ চলতি ব্যাপারী, চাষীর ছেলে কিংবা ডিঙ্গি নৌকোর মাঝি চোখের সামনে দেখছে কালো নেকড়কে, আবার পরক্ষণেই সে যাচ্ছে অদৃশ্য হয়ে।

দু তিন দিনের মধ্যে গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে কালো নেকড়ের বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ল। দিনের বেলা গ্রামের মানুষ প্রাণের টানে বাইরে বেরোয়। যে যার কাজ সেরে আবার সন্ধ্যের সময় দরজায় খিল এঁটে বসে থাকে।

তবু কি রক্ষে আছে?

এতদিন যে ভয়টা ছিল বাড়ির বাইরে, এবার সেটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আলেক্সির দুর্ভাগ্য। এ ব্যাপারেও তাঁর অভিজ্ঞতা হল সবার আগে। সেদিন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কাঁচের সার্সিতে হু হু করে বয়ে যায় বাতাস। উত্তপ্ত ফায়ার প্লেসের সামনে বসে আছেন আলেক্সি। আর ভাবছেন কালো নেকড়ের কথা।

সহসা মনে হল তাঁর খাটের তলায় খুট করে একটা শব্দ হল বুঝি। ঘাড় কাত করে দেখবেন, এমন সাহস তার নেই, চীৎকার করে ভাইকে ডাকবেন, এমন শব্দ তিনি জানেন না।

সেই অবস্থার মধ্যে বেশীক্ষণ থাকতে হলো না তাঁকে। খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলো এক লোমশ কালো নেকড়ে।

এত কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে যেন ইচ্ছে করলেই আলেক্সিকে ছুঁতে পারবে। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে নেকড়েটা বিকট গর্জন করল। তারপর লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল বন্ধ জানলার মধ্যে।

প্রচণ্ড শীতের রাতে ঘামতে শুরু করলেন আলেক্সি। পরের দিন সকালে খবর এল গ্রামের সাত-সাতটি বাড়ীতে ঐ নেকড়েকে দেখা গেছে। প্রতি বারেই সে অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দু'একদিনের মধ্যে প্রচণ্ড ভয়ে পনেরজন মারা গেল এখন গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, সাইবেরিয়ার যে সব সুইডিস সৈন্যরা মারা গেছে, তাদের অতৃপ্ত আত্মা নেকড়ে হয়ে রাশিয়ানদের ভয় দেখাচ্ছে।

অবশেষে অবস্থা এমন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় যে রাশিয়ান সরকার সাইবেরিয়ার অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তি দিলেন।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষে উন্নত জার্মানিতে আছে এক রহস্যময় ধারণা। ডিসেম্বর মাসে ওখানকার কিছু মানুষ নাকি নেকড়ে হয়ে যায়। এ ব্যাপারে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আছে। আছে বাস্তব প্রমাণ। এমনও দেখা গেছে যে ছেলে বলছে, তার বাবা ধীরে ধীরে বন্য নেকড়ে হয়ে যাচ্ছে। মেয়ে অভিযোগ করছে, সে তার মায়ের পাশে শোবে না কেননা ঘুম থেকে উঠে সে গলায় একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করে। তার বিশ্বাস সে ঘুমিয়ে পড়লে তার মা নেকড়ে হয়ে তার রক্ত পান করে।

ডেনমার্কের গ্রামীণ উপকথায় নেকড়ে মানুষের উল্লেখ আছে। তখনকার পুরোহিতরা নাকি ভুরুর গঠন দেখে বলে দিতে পারেন

কোন শিশু বড় হয়ে নেকড়ে মানব হবে। যেসব শিশুর এই বিশেষ ধরণের চিহ্ন আছে তারা শৈশব থেকে সকলের অবহেলা পেয়ে বড় হয়।

এই সব ঘটনা পড়লে মনে হয় মানুষ যতই তার বুদ্ধি নিয়ে বড়াই করুক, যতই সে জয় করার বিচিত্র নেশায় পা রাখুক মহা শূন্যে, অন্তরে সে হল ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় এক বালক মাত্র।

তাই তাকে বারবার চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখায় তুষার ঢাকা অরণ্যের ক্ষুধার্ত শীর্ণ নেকড়ে। সে বুঝি কোনদিন এই অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবে না।

টমাস হার্ডির কথায় বলতে পারি—উই আর ইন দ্য প্রেজেন্স এ্যাণ্ড আণ্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অব সামথিং, এ্যাজ ফার বিয়ণ্ড সামথিং দ্যাট ক্যান নট বি সীন।